ময়নামতীর দেশ

রঞ্জিত সিংহ

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট
কলকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা ও
পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিন্যু হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
চিত্রশিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী
ব্লক ও মুদ্রন—ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিও
কাগজ সরবরাহ করেছেন বেঙ্গল পেপার মিলসের শ্রীপ্রতাপ কুমার সিংহ।

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৫২
এক টাকা

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

আমার প্রথম বই

এই লেখকের আগামী প্রকাশ

পৃথিবীর ছেলেমেয়ে

সাত ভাই চম্পা

সম্রাট

তোমাদের কাছে

আমি নোতুন। ছেলেবেলায় এমন একটা বয়স থাকে যখন পদে পদে পথ-চলার আচম্‌কা খুশি আর হারিয়ে-যাবার নেশা শিশু মনের পল্লবে পল্লবে এসে দোলা দেয়, তখন আসে খেয়ালী-খেলার দিন; যে-দেশ সেসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে—সেটা হোলো শাসন-মানা দেশ। শাসনটা যখন মনের বাঁধন হয়ে শিশু-রাজ্যের দেউড়ী আগ্‌লে বসে থাকে, সেই সময়ে তোমাদের ভালো লাগে শাসনের আনাচে কানাচে বাঁধন-হারা মুক্ত-দেশের গল্প শুনতে—ভালোবাসো আশেপাশের জগতকে ভুলে গিয়ে রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যেতেঃ যে-দেশে তারায় তারায় হীরা-মাণিক জ্বলে আর রংমহালের হাজার রংমশাল ঝলমলিয়ে ওঠে সোনার রঙে! গল্প ফুরিয়ে যাবার পরেও বেশ যেন একটা ঘুমের নেশা সমস্ত শরীর মন জড়িয়ে থাকে, যেটাকে তোমরা হারাতে চাও না। কিন্তু সেটা যে হারিয়ে যাবার জিনিস্‌, তাই হঠাৎ কখন্‌ তোমাদের না জানিয়ে সে মিলিয়ে যায় কোন্‌ এক গহন পারের দেশে। সেটা পুরানো হয়ে যায় একসময়ে—অথচ সেইখানেই তার শেষ নয়—আরো গল্প চাই, অনেক অনেক নোতুন গল্পঃ ঘুমের আগের গল্প, রাজপুত্রের গল্প, মেঘের দেশের গল্প, সাত রাজ্যের এমন সব গল্প—যার কোনোদিন শেষ নেই! সুতরাং আমার এইসব গল্প যেদিন তোমাদের কাছে পুরানো হয়ে যাবে, সেই সংগে আমিও নিশ্চয় তোমাদের চেনা ও জানা হয়ে যাবো, কিন্তু পুরানো হবো না। কেননা, আমি নোতুন, আমি নবীনতার বন্ধু!

যেসব গল্প এই বইয়েতে স্থান পেয়েচে তার ভেতর 'ময়নামতীর দেশ' (ছোটদের পাততাড়ি, যুগান্তর) 'কাঞ্চনমালা' (রংমশাল) ও 'অনেক-আশার-দেশে' (বঙ্গশ্রী) এর আগে পত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েচে। বইয়ের ছবি ও প্রচ্ছদপট চিত্রশিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর সৌজন্যে।

ময়নামতীর দেশের সব গল্পই মন-গড়া কাহিনী—গল্প-বলার তাগিদে এদের দেহে রং বোলাতে হয়েচে। সুতরাং এদের কাছে কোন কৈফিয়ৎ নেই—তোমাদের ভালো-লাগার রাজ্যের দিকেই আমার নিশানা। এসব রূপকথার 'রূপ'-টাই আসল, 'কথা'-টা কিছু নয়। এখানে শুনতে পাবে সেই সব দেশের গল্প—যেখানে মেঘের হাওয়ার মতো উড়ে চলে মনের খুশি—যে-দেশে সারা বছর ঘুমিয়ে মাত্র একদিন জাগবার পালা, যে-রাজ্যে খেয়াল-খুশির টানে নীল-আকাশের পরী এসে ধরা দেয়, আর সেসব দেশের রাজপুত্র ভাবে ঃ 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে !'

শ্রাবণ-পূর্ণিমা, রবীন্দ্রাব্দ পঁচাশি।

গর্দানীবাগ, পাটনা ॥

—রঞ্জিতভাই

[অরুণ ও অলকভাই-কে :]

কিশোর আমার কচি কিশোর !

নতুন যুগের নতুন মানুষ দীপ্ত আশার খড়্গা হাতে—

এগিয়ে এসো চলার পথে !

বন্ধ দুয়ার শুকনো শাখায়,

আশীর্বাদের ঝর্ণা-ধারায়—

মৃত্যু-তুফান উড়িয়ে দেবো রংমশালের ফুলঝুরিতে !

দল্‌বো মাটি অন্ধকারে,

মুক্তি-বিহীন বন্ধ পারে—

সূর্য আলোর প্রভাত বেলায়

ভাঙ্গবো বেড়া এক তুড়িতে !

যাত্রাপথে দল্‌বো পাষাণ,

অভিযানের উড়বে নিশান—

আকাশ-পথে বজ্র-মেঘে উঠবে আলো ঝিল্‌মিলিয়ে !

রামধনুতে ফুলপরীরা

পাখনা-মেলা-গানের সুরে

আসবে বাদল সব ভাসিয়ে !

আমার কিশোর রইবে নাকো
পাতালপুরীর পাষাণ ঘরে--
রুদ্ধ আগল পড়বে ভাঙ্গি,
রংমশালের ফুলকী ঝরে,
হাসনুহানার নেশায় রাঙি।
সবুজ-কচি ঘাসের বুকে 'অনেক-আশার' রাজ্য আছে—
কল্পনারই জলসায়রে সওয়ার হবো পক্ষীরাজেঃ
সাত সাগরের মাঠ-নদী-বন
সব পেরিয়ে
দেখবো চেয়েঃ
সাতরঙা-মেঘ ময়নামতীর নিঝুমপুরী;
কিশোর মনের ছোঁয়াচ লেগে
ফুলপরীদের ফুলবাগানে
উঠবে জেগে
ঘুমন্ত সব ফুলের কুঁড়ি! ৯

'চম্পাবতীর চম্পা বনে'
মৌমাছিরা ভিড় লাগাবে—
প্রজাপতির পাতলা পাখায়
লাগবে কাঁপন নতুন খেলায়,
গান গেয়ে সেই প্রভাত বেলায়
অশোক-বনে ঘুম ভাঙ্গাবে।
রইবো আমি সংগে তোমার চিরদিনের ছোট্ট সাথী—
মশাল যদি যায় সে নিভে, রইলো আমার রঙিন বাতি।

ময়নামতীর দেশ

একটা নোতুন গল্প বলি শোনো ঃ

জ্যোছনাভরা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে যাও সামনে···কঙ্কাবতীর ঘাটের পাশে ঐ যে সরু পথটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েচে পূবদিকে—ঐ পথ ধরে চলে যাও। মাঝখানে পড়বে বিষ্ণুপুরের মস্ত বড় হীরক ঝিল, ডাইনে স্থরু হবে কদমছায়া ঘেরা মেঠো পথ—সেই পথে যেতে যেতে দেখতে পাবে সামনে এক মস্ত সহর জ্যোছনায় ঝল্‌মল্‌ করচে। নাম তার তনয়পুর।

এই সহরে তোমরা কোনোদিন আসোনি, তনয়পুরের নাম তোমরা কখনো শোনোনি। এদেশের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই—তাই আমার সঙ্গে এসো, হাত ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলো—ঐ দূরে চেয়ে দেখো ঃ তনয়পুরের রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়া দেখা যায়। বেশ এবার শোনো ঃ

মহারাজের মনে চিন্তার শেষ নেই। বড় আদরের মেয়ে মণিমালা—কঠিন অস্থখ তার। অমন আদরের রাজকুমার মোহনলাল আজ থেকে অনেকদিন আগে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে

গেছে কেউ তার খবর জানে না। এদিকে মণিমালার কঠিন অসুখ। দেশবিদেশ থেকে কতো কবিরাজ বৈদ্য চিকিৎসক এলো, কিছুতেই কিছু হোলো না। শেষে সাত সমুদ্দ র তেরো নদীর পার থেকে এলেন এক গরীব ব্রাহ্মণ। মহারাজ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই গরীব ব্রাহ্মণ বললেন: মহারাজ, এসবে মণিমালার কিছু হবে না। আরো অনেক কঠিন কাজ আছে।

মহারাজ ব্যস্ত হয়ে জিগেস করলেন: কী করতে হবে বলুন?

ব্রাহ্মণ বললেন: ময়নামতীর দেশে 'বনঝাউ' নদীর পাশে এক সবুজ পাহাড় আছে—সেখানে আছে এক সোনার মন্দির—সেইখানে খোঁজ করো: সোনার পাথর বাটী আর রাঙ্‌চিতা মধু। সেই এনে মণিমালাকে দিও রাত পোহাবার আগে; সব. অসুখ ভাল হয়ে যাবে। এই বলে গরীব ব্রাহ্মণ কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন—কেউ তার খোঁজ পেলে না।

রাজ্যময় কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মণিমালার কোনো কিনারা হোলো না। পরদিন ভোরবেলাতে রাজপুরোহিত জয়দত্তের ডাক পড়লো। মহারাজ বললেন: জয়দত্ত এবার শেষ চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে। জয়দত্ত চুপ করে শুনে.

গেলো—ময়নামতীর দেশে ‘বনঝাউ’ নদীর পাশে এক সবুজ পাহাড়, সেখানে এক সোনার মন্দিরে সোনার পাথর বাটী আর রাঙ্‌চিতা মধু আছে। মণিমালাকে তাই এনে দিতে হবে রাত পোহাবার আগে ; সব অসুখ সেরে যাবে।

—সোনার পাথর বাটী ? জয়দত্ত খুব অবাক হয়ে গেলো এবার। মহারাজ বললেন ঃ হ্যাঁ জয়দত্ত, সোনার পাথর বাটী চাই। যে এনে দিতে পারবে তার সঙ্গে মণিমালার বিয়ে আর সমস্ত রাজত্ব যৌতুক দেব।

জয়দত্ত রাজমন্দিরের কাজ সেরে বাড়ী ফিরে এলো। সোনার টুকরো ছেলে রূপকুমার এসব শুনে বললে ঃ মণিমালাকে আমিই বিয়ে করবো। তাই চললাম ময়নামতীর দেশে—বিদায় ! এই বলে রূপকুমার বুক ফুলিয়ে রাজবাড়ীতে এলো। মহারাজের দরবারে সে এসে বললে ঃ মহারাজ আমিই মণিমালাকে বিয়ে করবো। ময়নামতীর দেশে সোনার পাথর বাটী আনতে চললাম—আদেশ দিন।

খুশীতে মহারাজের চোখ চিকচিক্ করে উঠলো। বললেন ঃ তুমি পারবে রূপকুমার ?

—নিশ্চয়ই মহারাজ ! মৃত্যুকে আমি ভয় করি নে। মহারাজ আদেশ দিলেন ঃ বেশ—একমাস সময় দিলাম।

ময়নামতীর দেশ

সেদিন তনয়পুরে বাঁশী বাজলো, রাজবাড়ীতে শোনা গেলো নহবতের সুর। রাজ্যময় সাড়া পড়ে গেলো! রূপকুমার নাকি ময়নামতীর দেশে রওনা হবে। পক্ষীরাজ ঘোড়া এলো, আর এলো রাজ্যের যত ছেলেমেয়ে। বিদায় নেবার আগে রূপকুমার মণিমালাকে বলে গেলো: আমার জন্যে ভেবোনা। তোমার জন্য রইলো এই নীলার আংটী আমাকে মনে করো, কেমন—? এই বলে মণিমালার হাতে সেই আংটী পরিয়ে দিয়ে রূপকুমার রওনা হোলো ময়নামতীর দেশে।

সাতদিন সাতরাত কেটে গেলো পথে পথে কিন্তু কোথায় ময়নামতীর দেশ? রূপকুমার মনে মনে ভাবলে দেশান্তর পার হয়ে তাকে যেতে হবে অনেক দূর, ভয় পেলে চলবে কেন?

কতো বন পাহাড় মাঠ নদী গিরি উপত্যকা পেরিয়ে পক্ষীরাজ ছুটলো···মেঘের মধ্যে কখনো পথ হারিয়ে যায়, আবার কখনো সোনালী রঙের রোদ্দুর খুশীতে চিক্‌চিক্ করে। আবার পথ···এমন করে আরো সাত দিনের পর রূপকুমারের পক্ষীরাজ এসে থামলো এক মাঠের ধারে। ধূ ধূ করচে মাঠ—জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই। ঐ দূরে আকাশ এসে মিশেচে মাটির সঙ্গে।

তৃষ্ণায় রূপকুমারের বুক ফেটে যায়, কোথায় এতোটুকু জল পাওয়া যায়? মাঠের ধারে মস্ত এক বটগাছ। তার ছায়ায় রূপকুমার ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। একেবারে নিবিড় ঘুম। রাত এদিকে শেষ প্রহর, আকাশে মস্ত চাঁদ ঝলমল করচে। চারদিক নিথর নিঝুম। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই—। রূপকুমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো :

মস্ত এক রাজপ্রাসাদ—রূপোলী জ্যোছনায় ঝকমক করচে যেন। রাজপ্রাসাদের চারদিকে সুন্দর সবুজ বাগান, সেখানে রংবেরঙের রংবাহারী ফুল, নিথর নিঝুমপুরী—কোথাও কারো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। চুপি চুপি রূপকুমার এগিয়ে চললো··· রূপোলী জরি মোড়া কার্পেট পাতা মস্ত মস্ত ঘর দালান, সাত মহলা রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে যেন স্বপ্নের যাদু! রূপকুমার অবাক হয়ে এসে বসলো এক জলের ফোয়ারার ধারে। বড় তৃষ্ণা পেয়েচে তার—তাই আজলা করে যেই জল খেতে যাবে অমনি কোথা থেকে কে এক সবুজ টিয়া বললে : ওগো ভিনগাঁয়ের রূপকুমার, এই নীলসায়রের ফোয়ারায় মায়াকাজলের ছোঁয়া আছে—আমার সোনার যাদু, এ দেশ থেকে পালাও। রূপ-কুমার মুখ তুলে চেয়ে দেখে তার মাথার উপর দিয়ে এক সবুজ টিয়া উড়ে গেলো। সে ভাবলে এ আবার কেমনধারা দেশ?

জলের সঙ্গে মায়াকাজলের ছোঁয়া ? দূর ছাই ওসব বাজে কথা—এই ভেবে সে আজলা করে জল নিয়ে আকণ্ঠ পান করে নিলো। তারপর সেই রাজপ্রাসাদের সাতমহলা ঘরের এক সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে ময়নামতীর দেশের কথা তার মনে নেই—মায়াকাজলের ছোঁয়ায় সব ভুলে গিয়েচে। ভোর হবার অনেক আগে তার ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলতেই রূপকুমার চমকে উঠলো। সামনে দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যে—রূপ যেন ফেটে পড়চে। এক হাতে তার সোনার কাঠি আর একহাতে সোনার থালায় পদ্মমধুর সরবৎ। রূপকুমার চোখ মেলতেই রাজকন্যে পদ্মমধুর গোলাপী সরবৎ এগিয়ে দিলো তার হাতে। মুখে চাঁদের মতো মিষ্টি মধুর হাসি। রূপকুমার পরম আনন্দ সরবৎ খেয়ে নিলো। রাজকন্যে বললে এবার ঃ কি গো ভিনগাঁয়ের রাজপুত্তুর, কোথায় তোমার বাস ?

রূপকুমার বললে ঃ তনয়পুরের রাজপ্রাসাদে আমার ঘর, ময়নামতীর দেশ খুঁজতে বের হয়েচি।

—ময়নামতীর দেশ ? সে আবার কেমনধারা দেশ ? রাজকন্যে হেসেই আকুল।

রূপকুমার বললে ঃ সে তো জানিনে, তনয়পুরের রাজকন্যে মণিমালার কঠিন অসুখ। মহারাজ আদেশ করেচেন ঃ ময়নামতীর

দেশ থেকে যে সোনার পাথর বাটী আর রাঙচিতা মধু এনে মণি-মালাকে উপহার দিতে পারবে, সে হবে এই দেশের রাজা। তাই আমার সাতদিন সাতরাত কেটে গেচে পথে···মাত্র একমাসের সময়। সোনার পাথর বাটী আমার চাই।

রাজকন্যে হেসে বললে ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোমায় সোনার পাথর বাটীর সন্ধান দিই আমায় কী দেবে? রূপকুমার বললে ঃ তোমার পরিচয় না জানলে কী করে বলি? রাজকন্যে বললে— আমার নাম ফুলকুমারী। অনুমৃপা নদীর বাঁকে যে মস্ত এক সবুজ দেশ আছে সেখানকার মৎস্যরাজের মেয়ে আমি। কাল আমাদের দেশে পদ্মমধুর উৎসব। সারাবছর ঘুমিয়ে থাকি, আজ আমাদের জাগবার পালা। এবার বলো তোমায় যদি পথের সন্ধান দিই, আমায় কী দেবে?

ফুলকুমারীর সমস্ত কথা শুনে রূপকুমার বললে ঃ সাত রাজ্যের মাণিক এনে তোমায় উপহার দেব।

ফুলকুমারী দুষ্টু হাসি হেসে বললে ঃ ওগো আমার সোনার যাদু রাজপুত্তুর, মৎস্যকন্যা অতো সহজে ভোলে না। এই বলে সে রূপকুমারের কপালে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলো। অমনি রূপকুমারের চোখের পাতায় নেমে এলো গভীর ঘুম। সে ঘুম আর ভাঙ্গেনা। ফুলকুমারী এদিকে মহা খুশী—দুলেদুলে গান

গায়ঃ এবার যাদু মনের সুখে ঘুমাও—চিরদিনের মতো বন্দী।

সাতদিন সাত রাত্তির পর রূপকুমারের যেন ঘুম ভাঙ্গলো। ঘুম ভাঙ্গতেই রূপকুমার শুনতে পেলো তার কানের কাছে সেই সবুজ টিয়া গান গাইচেঃ ময়নামতী! ময়নামতী! রূপকাজলের মায়া আর পদ্মমধুর সব—ভোলান স্বাদে রূপকুমার বিভোর হয়ে গেলো। আকাশবনের ফুলবাগানে সবুজ টিয়া উড়ে গেলো। তার সঙ্গে রূপকুমার ছুটতে লাগলো···কোথায় তার সবুজ টিয়া? শুধু কানে ভেসে আসচে—ময়নামতী! ময়নামতী!

এবার নোতুন করে ঘুম ভাঙ্গলো রূপকুমারের, সেই তেপান্তরের মাঠের ধারে বটছায়ার নীচে স্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়েচে। সোনালী রোদ্দুরে মাঠ বন পাহাড় চিক্‌মিক্ করচে। আর ত ঘুমিয়ে থাকা চলে না, এবার যেতে হবে ময়মামতীর দেশে—স্বপ্নের কথা রূপকুমারের আর মনে নেই।

সেই বটগাছের আগডালে বসেছিলো শুক আর সারী।

শুক বললে ঃ আচ্ছা ভাই, এই বট ছায়ার কোলে কে ঘুমিয়ে আছে ? কোন্ দেশের রাজপুত্তুর ?

সারী বললে ঃ জানো না বুঝি, তনয়পুরের রাজকন্যে মণিমালার কঠিন অসুখ, তাই সোনামাণিক রূপকুমার চলেচে ময়নামতীর দেশে।—সোনার পাথর বাটী আর রাঙচিতা মধুর সন্ধানে…

শুক বললে ঃ ময়নামতীর দেশ ? সে আবার কোথায় ?

সারী বললে ঃ সোজা চলে যাও পূবদিকে—দশ দিনের পথ। সবুজ পাহাড় ঘেরা 'বনঝাউ' নদী আর তার বুকের কাছে ময়নামতীর দেশ। পদ্মমধুর সোনালী সৌরভে মৌমাছিদের গুনগুন গান শুনতে পাবে, আর জ্যোছনা মায়ার লুকোচুরি খেলা চলবে কদমবনের ছায়ায় ছায়ায়। সে দেশে রাঙ্চিতা মধু মেলে না।

শুক জিগেস করলে ঃ কিন্তু সোনার পাথর বাটী ?

এবার সারী বললে ঃ সেজন্যে যেতে হবে জ্যোছনারাতের শেষপ্রহরে ঐ কাঞ্চন বনের দক্ষিণ দিকে।—সেখানে আছে বেণুবনের কুঞ্জ, দুষ্টু ফুলকুমারী আসল ময়নামতীকে সবুজ টিয়া

বানিয়ে বন্দী করে রেখেচে। সেই খোঁজ দেবে সোনার পাথর বাটী আর রাঙচিতা মধু।

সেই কথা শুনে আনন্দে দিশেহারা হয়ে রূপকুমার পক্ষীরাজে চেপে ছুটলো পূবদিক ঘেঁষে—দুরন্ত গতিতে। মাত্র দশদিনের পথ—আর সময় নেই।…দশদিনের পথ শেষ হোলো—হেমন্তের এক সন্ধ্যায় রূপকুমার গিয়ে থামলো ময়নামতীর সীমান্তে…ঐ দূরে বোধ হয় 'বনঝাউ' নদী ম্লান জ্যোছনায় চিকচিক্ করচে। হেমন্ত রাতের নীল কুয়াসা চারদিকে পাতলা চাদর ঝুলিয়েচে—রূপকুমার ক্লান্ত হয়ে নেমে পড়লো 'বনঝাউ'র জলে—পিপাসা তৃপ্ত হোলো ; বড় সুন্দর এই দেশ,—যেন স্বপ্নপুরী।

—ময়নামতী ! ময়নামতী ! হঠাৎ রূপকুমার চমকে উঠে চেয়ে দেখে ঃ কুয়াসাভরা আকাশে এক সবুজ টিয়া উড়ে গেলো। —ঐ কি সেই বেণুবনের বন্দিনী ময়নামতী ?

দূরে কোথায় যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। কারা যেন এই দিকেই আসচে। রূপকুমার পিছন্‌পানে চেয়ে অবাক হয়ে গেলো। দূরে—আরো দূরে—কারা সব নীল রংমশাল হাতে গান গাইতে গাইতে এই দিকে আসচে। তাইতো, এই বিজন বনের মুক্তিধারায় তোমরা কে গো—গানের সুরে সুরে ভেসে আসচ ? রূপকুমারের ভারী আনন্দ হোলো—তাকে অভিনন্দন

জানাতে এসেচে সারি সারি স্বর্গের পরীরা—হাতে একটি করে রংমশাল, খোঁপায় চামেলির মালা, অঙ্গে রূপোলী শাড়ী আর সোনালী ওড়না। কাজল টানা চোখে নয়নতারার ঘুম।

একজন বললেঃ ওগো তনয়পুরের রাজতনয়, এসো আমাদের সঙ্গে, অভিনন্দন গ্রহণ করো! আর একজন বললে—ওগো আমার স্বপ্নহারা বন্ধু, এসেচ ময়নামতীর দেশে—এবার চলো রাণীমার কাছে। সবার পিছনে যে মেয়েটি ছিল সে বললে, ইস্। ভারী তো রূপের ছটা, তায় আবার রূপকুমার নাম? কেমন হয়েচে এবার এসো, তুমি আমাদের বন্দী! বলেই সে হেসে উঠলো। আর অমনি সবাই মিলে রূপকুমারকে ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করলে ময়নামতীর মায়াপুরীতে।

এই হোলো ময়নামতীর দেশ। কী অদ্ভূত দেশ! যেন সমস্ত দেশটা স্বপ্নের ঝালরে মোড়া। গাছে গাছে, পাতায় পাতায় জ্যোছনা কাজলের মায়ার পরশ, আকাশে বিশাল নীল সমুদ্র—অচীন্ দেশের নাম-না জানা পাখীরা এখানে এসে গান গেয়ে গেয়ে ভোরবেলাকার দোলনচাঁপা আর সন্ধ্যাবেলার যুঁইমালতীর ঘুম ভাঙ্গায়···লতায় পাতায় কুহকের স্বপ্নজাল বোনা। মাঠ বন পাহাড় নদী সব যেন স্বপ্নের যাদুপুরী, ময়নামতীর মায়াপুরী যেন ক্ষীর সায়রে পদ্মমেলা।

আশ্চর্য এই দেশ। রূপকুমার অবাক হয়ে এর রূপের ছটায় মুগ্ধ হয়ে গেলো। সেই মেয়েটি আবার বললে—কি গো সোনার ছেলে, অমন করে চেয়ে দেখচ কি ?

রূপকুমার হেসে বললে—ঐ আকাশের চাঁদ আর তোমার রক্ত রাঙা মুখ।

মেয়েটি বললে—ইস ! সবাই হেসে উঠলো…যেন সেও একটা গানের স্থর।—

এবার চলে এসো সেখান থেকে। ঐ চেয়ে দেখো সোনার পালঙ্কে শুয়ে ময়নামতীর দেশের রূপবতী মহারাণী—রূপের ছটায় সাত রাজ্যের ফুলপরীরা হার মানে। রূপকুমার কিন্তু ঠিক চিনে ফেললো তাকে—এই সেই দুষ্টু ফুলকুমারী, যে তাকে পদ্মমধুর গোলাপী সরবৎ খাইয়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়েছিল। কিন্তু কোথায় সেই বেণুবন আর বন্দিনী ময়নামতী ?

ফুলকুমারী বললে ঃ তুমিই তনয়পুরের রূপকুমার ? ময়নামতীর দেশে সোনার পাথর বাটী খুঁজতে বেরিয়েচ বুঝি ? কিন্তু এখানে তো রাঙচিতা মধু পাবে না যাদু, এ যে পদ্মমধুর দেশ। কাল আমাদের পদ্মমধুর উৎসব। অনুম্পা নদীর বাঁকে কাল আমাদের আনন্দ-মেলা বসবে। আমরা সারা বছর

ঘুমিয়ে কাটাই, শুধু এই দিনটা জাগবার পালা।...কী আশ্চর্য ওসব কথা ফুলকুমারী জানলো কেমন করে?

রূপকুমার বললেঃ বেশতো। সে পদ্মমধুর উৎসবে আমিও যোগ দেবো, আর আনন্দ মেলায় গান গেয়ে আসর জমাব।

ফুলকুমারী বললেঃ না-না সে হবে না। তুমি আজ থেকে এখানে বন্দী। জানো এর আগে কোনোদিন এদেশে পুরুষমানুষ আসেনি, এখানে সবাই মেয়ের দল বাস করে। এখানে পাঁচ হাজার এমনি স্বর্গের পরী আছে। এদেশে যারা আসে, কুহকের স্বপ্নজালে চিরদিনের জন্য বন্দী থাকে।

—চিরদিনের জন্য বন্দী? রূপকুমার ভয়ে ভয়ে জিগেস করলে।

ফুলকুমারী বললে—হ্যাঁগো। এই জন্মে আর তনয়পুরে ফিরতে পাবে না। অনেক দিন আগে তোমার মতো আর একজন রাজপুত্তুর এদেশে পথ ভুলে আসে, নাম তার মোহনলাল।

—মোহনলাল? তনয়পুরের মহারাজের হারানো ছেলে মোহনলাল? রূপকুমার চমকে উঠলো। ফুলকুমারী বলে চললোঃ সেতো জানিনে। তবে এদেশে এসে পড়ে সে আবার

তনয়পুরে ফিরে যেতে চাইলে। আমরা সবাই বললাম ঃ সে হবে না বন্ধু, তোমাকে চিরদিনের জন্য এখানে থাকতে হবে। কোথাও যেতে পাবে না। সে রাজী হোলো না। পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু এ ময়নামতীর দেশ, কিছুতে নিস্তার নেই। দিলাম তাকে অজগরের বুকে ঘুম পাড়িয়ে। এই বলে দুষ্টু ফুলকুমারী মুখ টিপে হাসতে লাগলো। রূপকুমার ভাবলে যেমন করে হোক বন্দিনী ময়নামতীকে খুঁজে বের করতেই হবে। নয়ত তাকেও অজগরের গর্ভে যেতে হবে।

ফুলকুমারী বললে—বুঝলে রূপকুমার এবার আমায় বিয়ে করতে হবে—এই মায়াপুরীর মুক্তা সিংহাসন তো তোমারই। আমরা দুজন আনন্দে দিন কাটাব, বনে বনে গান গেয়ে বেড়াব কেমন ? রূপকুমার মনে মনে ভাবলে কিন্তু মণিমালার নীলার আংটী ? বললে—বেশ তাই হবে।—এসো, আমার সাতরাজ্যের মাণিক এসো—বলে ফুলকুমারী রূপকুমারকে টানতে টান্‌তে ছুটলো মৌ বনের পদ্মমধুর উৎসবে।

ময়নামতীর মেয়েরা এবার জাগলো—ভোর হয়েচে। দলে দলে ফুলপরীরা রঙিন ফুলের ডালি হাতে পথে পথে গান সুরু—করলে বেলফুলের মালায় আর গোলাপ, চাঁপা

ঝাউয়ের তোড়ায় সমস্ত দেশটা যেন ভরে উপচে পড়লো। রক্তরাগ কুমকুমের রঙে সারা মায়াপুরী রাঙা হয়ে উঠলো, বনে বনে জাগলো ঘুমন্ত ফুল, জাগলো বনের পাখীরা আর নয়নতারার মেয়েরা সবাই আজ জাগলো, এখানে মায়াকাজলের ছোঁয়া নেই, নেই কোনো দুঃখ, দেনা দারিদ্র্যের স্রোত। সবাই আজ আনন্দে মাতোয়ারা। সারা বছর পরে আজ শুধু জাগবার পালা। সারা দেশময় উৎসব চলেচে। পথে ঘাটে, মাঠে বনে—আকাশ জুড়ে ফুলপরীদের আনন্দমেলা বসেচে। আর ফুলকুমারী সখীদের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে আনন্দমেলার আসরে ফুল ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এদিকে কিন্তু রূপকুমার বন্দী আছে মায়াপুরীর ফুলবাগানে। সে ভাবচে ঃ কোথায় সেই বন্দিনী ময়নামতী ?

এমন করে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যা নামচে আকাশের রূপোলী আচলা দুলিয়ে। চারিদিকে অমনি রংমশালের আলো জ্বললো…মৌ পরীরা গান গাইলো আবার নোতুন সুরে—ময়নামতীর দেশ আলোতে আলোময়। রাত গভীর হয়ে এলো। রূপকুমার কিন্তু ভাবচে ঃ কী করে সে মুক্তি পায় ?

গভীর রাত। দূরে—অনেক দূরে ফুলকুমারীর গান ভেসে আসচে, একে একে সব নীল রংমশাল নিভে এলো, সবাই ফিরে এলো নিজের ঘরে। আবার ঘুম। 'প্রহর শেষ হয়ে আসচে…

কিন্তু এখনো রূপকুমার মায়াপুরীতে বন্দী। হঠাৎ তার মনে পড়লো শুক সারীর কথা। অমনি সে ছুটলো কাঞ্চন বনের দিকে। এসে দেখলে ঃ জ্যোছনা আলোয় বেণু বনের কুঞ্জ ঝলমল করচে। আর তার মাঝে সেই সবুজ টিয়া সোনার খাঁচায় বন্দী।—ময়নামতী! ময়নামতী! সবুজ টিয়া কেঁদে উঠলো—এসো ভাই রাজপুত্তুর, আমাকে মুক্ত করো। রূপকুমার বুঝতে পারলে, এই সেই বেণুবনের বন্দিনী ময়নামতী।

তখন রূপকুমার বললে—কী করে তোমায় মুক্ত করবো, তুমি সোনার খাঁচায় বন্দী? সবুজ টিয়ে বললে ঃ বেণুবনের চারপাশে সাতপাক রেশমী সূতো আছে, তাকে কেটে ফেলো। তাহলেই আমাকে ফিরে পাবে। রূপকুমার অমনি তলোয়ার বের করে সেই রেশমী সূতো কেটে ফেললো। আশ্চর্য, দেখতে দেখতে সেই সোনার খাঁচার সবুজ টিয়া এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যে হয়ে গেলো। ইস্! কী তার রূপ—যেন চাঁদও তার কাছে হার মানে। ময়নামতী লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলবে একথা সবাই জানে। কিন্তু ময়নামতী রূপকুমারের বুকে মাথা রেখে বললে ঃ জানি তুমি আসবে একদিন। শুক সারী আমার বন্ধু, সেই তোমাকে পথ চিনিয়ে দিয়েচে তোমায় আর ছাড়ব না কিন্তু!

রূপকুমার আনন্দে দিশেহারা হয়ে বললে ঃ তোমার জন্যই

ময়নামতীর দেশ

আজ দেশছাড়া হয়েছি—কতো দেশ, কতো মাঠ নদী বন উপত্যকা পার হয়ে তোমার কাছে ছুটে আসছি—কেন জানো ?

—জানি গো জানি ঃ ময়নামতী বললে—কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। এসো, এদেশ থেকে আমাদের পালাতে হবে। শীগ্‌গির চলো, ঐ দেখো পোহাতী তারা বিদায় নিলো।

তারপর রূপকুমার আর ময়নামতী চলে এলো 'বনঝাউর' পাশে। সেখানে তার পক্ষীরাজ ছিল বাঁধা। ভোরের আগেই পক্ষীরাজ ছুটলো ঐ সামনের সবুজ পাহাড়ের দিকে।

ময়নামতী বললে ঃ তোমার কথা আমি জানি। আর তিনদিন মাত্র সময়, তার মধ্যেই তোমাকে সোনার পাথর বাটী আর রাঙচিতা মধু দেব। রাগ কোরোনা যেন, তোমায় একটা কথা বলি—

রূপকুমার বললে ঃ না গো না কী বলবে নির্ভয়ে বলো।

ময়নামতী বললে ঃ মণিমালার নীলার আংটীর কথা আমি জানি। তোমার সঙ্গে আমিও যাব তনয়পুরে। মণিমালা আমার ছোট বোন। তাকে আমার চাই।

এবার রূপকুমার দুষ্টুমি করে বললে ঃ আর আমাকে ?

ময়নামতী হেসে বললে ঃ যাও দুষ্টু ছেলে! তোমাকে আমার চাই না—বলে রূপকুমারের হাতে সে মুক্তার আংটী পরিয়ে

দিলো। আর ময়নামতীর গলায় ফিরে এলো রূপকুমারের হাতের বকুল ফুলের মালা।

তারপর পক্ষীরাজ এসে থামলো সবুজ পাহাড় ঘেরা এক সোনার মন্দিরের কাছে। সমস্ত আকাশ আলোতে আলোময়। সূর্যের সোনালি ঝর্ণা! রূপকুমার ও ময়নামতী নামলো পক্ষীরাজ থেকে। ময়নামতী ইশারা করলেঃ কথা কয়ো না, অজগরটা বোধ হয় ঘুমিয়ে আছে!…তারা দুজনা চুপি চুপি এগিয়ে চললো মন্দিরের দিকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রূপকুমার, ভয়ে সারা শরীর কাঁপচে। ইস্! কী ভয়ানক ঐ অজগর সাপ—জোট পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে মন্দিরের কাছে, কী উজ্জ্বল তার মাথার মণি! কিন্তু ওকে? অজগরের বুকের কাছে কোন্ এক রাজপুত্তুর ঘুমিয়ে আছে?

ময়নামতী বললেঃ ঐ তোমাদের হারানো ছেলে মোহনলাল। আর ঐ অজগরের মাথায় সোনার পাথরবাটী আর রাঙচিতা মধু—ঐ মণি কেটে আনতে পারবে অজগরের মাথা থেকে?

—নিশ্চয়! মৃত্যুকে আমি ভয় করিনে! এই বলে রূপকুমার চক্‌চকে ধারালো তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেলো সেই ভয়ঙ্কর

অজগরের পানে। মানুষের সাড়া পেয়েই ঘুমন্ত অজগরটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে গর্জন করতে করতে তেড়ে এলো রূপকুমারকে গিলে ফেলবার জন্যে! অজগরের হিংস্র চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলচে। কিন্তু তার আগেই রূপকুমার এক প্রচণ্ড লাফে অজগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু করে দিলো। অজগরটা জড়িয়ে ধরেচে তাকে, এই ছোবল মারবে! কিন্তু রূপকুমারের তলোয়ারের সামনে সে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে বলো? তার সমস্ত শরীর বেয়ে রক্ত ঝরচে, আর এক একবার ভীষণ আক্রোশে ফণা তুলে তেড়ে আস্‌চে। রূপকুমার সুযোগ বুঝে তার মাথায় বসিয়ে দিলো এক কোপ! কেটে দুখান হয়ে গেলো অজগরের মাথা। শেষে ব্যর্থ হয়ে অজগরটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে নিঃসাড় হয়ে গেলো! অমনি ময়নামতী ছুটে এসে সেই অজগরের রক্ত মোহনলালের কপালে লাগিয়ে দিলো। অভিশপ্ত ঘুম থেকে জেগে উঠলো মোহনলাল, যেন কত যুগ পরে আজ সে প্রথম জাগলো। মোহনলাল আশ্চর্য হয়ে বললো: তোমরা কে ভাই? এটা কোন দেশ?

উত্তর দিল ময়নামতী: এ হোলো কুহকের পদ্মমধু ভরা ময়নামতীর দেশ।

আর রূপকুমার বললে: আমি তনয়পুরের জয়দত্তের ছেলে

রূপকুমার। আর এ আমার বন্ধু—বলে ময়নামতীর দিকে চাইলো। ময়নামতী মুখটিপে হাসচে। মোহনলাল বললে ঃ তনয়পুরের ছেলে রূপকুমার ? অজস্র ধন্যবাদ তোমায়। এবার চলো ভাই আবার দেশে ফিরে যাই—আমার বড় মন কেমন করচে।

রূপকুমার অজগরের মাথার মণি কেটে নিয়ে হাতে নিলো সোনার পাথর বাটী আর রাঙচিতা মধু। তারপর তারা তিনজনে ময়নামতীর দেশ ছাড়িয়ে রওনা হোলো সোজা তনয়পুরের দিকে।

—তারপর ? আরো জানতে চাও ?

—বেশ, চুপটী করে শোনো ঃ তিনজনে ফিরে এলো দেশে। আবার বাজলো বাঁশী, বাজলো নহবৎ—রাজ্যময় আবার সাড়া পড়ে গেলো। রূপকুমার ফিরেচে সোনার পাথর বাটী নিয়ে, আর সঙ্গে এসেচে মোহনলাল। আশ্চর্য, এ যেন স্বপ্নকেও হার মানায়। মহারাজ আনন্দে আত্মহারা—সোনার ছেলে মোহনলাল আবার এসেচে। আনন্দ হবে না ? আর মণিমালা ? রূপকুমার নিজের হাতে সেই সোনার পাথর বাটীতে রাঙচিতা মধু মণিমালার

মুখে দিলো—সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চেয়ে দেখলো তার সামনে রূপকুমার। আনন্দে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বললে: জানি তুমি আবার আসবে। তোমার জন্যে আমার চোখে ঘুম নেই। কিন্তু ওকে?

ময়নামতী এবার হেসে মণিমালাকে তার বুকে নিয়ে বললে: আমি তোমার দিদি।

আমার কথা এবার ফুরুলো। এর পর যদি আরো জানতে চাও, সোজা চলে যাও আমার তনয়পুরে—রাজপ্রাসাদের দেউড়ী পার হয়ে—আরো যাও—ফুলবাগান পার হয়ে—আরো একটু চলো—একেবারে সোজা রাজসভায়…

—সোনার সিংহাসনে কারা বসে আছে যেন?

—সেকথা আমি বলবো না।

কাঞ্চনমালা

এক

রতনগড়ের কাহিনী

কথা কয়োনা চুপ করে শোনো।

নীল আকাশের কোল ঘেঁষে মলয়পুরের পাহাড়—সামনে—অনেক দূরে—ঐ পাহাড়ে রক্তপলাশের বন। সেই বনের যে-চপল ঝর্ণা, তারই এক পাশে সবুজ ঘাসের স্বপ্নশয্যা……

আস্তে আস্তে পা ফেলো—এসো আমার সংগে—এইদিকে—কাঞ্চনমালার ঘুম ভাঙিও না কিন্তু? চুপ করে শোনোঃ সবুজ গল্প, সবুজ নিশান…সবুজ এক স্বপ্নদেশ……

ছোট্ট মেয়ে কাঞ্চনমালা। ফুলবনে গান গেয়ে, মৌ-বনে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে…কাঞ্চনমালা স্বপন-পরীর পাখনা মেলে অসীম আকাশ বনে তারাফুলদের ঘুম পাড়ায়……আর দুষ্টুমি করে ডাকেঃ কুহু! কুহু! কুহু!

একদিন পথভুলে কাঞ্চনমালা এসে পড়লো রতনগড়ের সীমানায়।

রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় শোনা গেলো এক জ্যোছনা রাতেঃ—কুহু! কুহু! কুহু!

ময়নামতীর দেশ

সারা দেশময় সাড়া পড়ে গেলো। এমনি সব আশ্চর্য কথা কেউ কোনদিন শুনেচে ?

সাত সমুদ্দ্‌র তেরো নদীর পার থেকে চুণি-পাথর-হীরা-মাণিক এনে তৈরী হোলো রতনগড়ের রাজপ্রাসাদ, নীল আলোর ঝালরে সর্বদা যেন ঝলমল্‌ করচে—স্বপনপুরীর শংখমালার মতো। মহারাজ জয়সিংহের দুর্দান্ত প্রতাপে দেশের চাষা-মজুর থেকে নিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোকেরা সুখে-শান্তিতে বাস করে। কেন, মনে নেই ? সেবার মলয়কেতুর সংগে যুদ্ধ বাধলো যেমনি রতনগড়ের —অমনি হাজার হাজার আশ্রয়হারা প্রজা অনুম্‌পা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রতনগড়ের জয় হোলো—কিন্তু সেই সব মানুষের স্মৃতি অনুম্‌পার গর্ভে কোথায় মিলিয়ে গেলো !

এমনিতরো যে দেশ রতনগড়—সেই দেশে আজ সাড়া পড়ে গেচে। আশ্চর্য, এমনি সব গল্প কেউ কোনোদিন শুনেচে ? যদি না শুনে থাকো, আমার কাছে শোনো।

মহারাজের চোখের পাতায় নেমে এসেচে অকাল-মৃত্যুর ঘুম। মনে চিন্তার শেষ নেই—বয়সের সংগে সংগে মনের কোণেও পাক ধরেচে। রতনগড়ের রাজা হবে কে ? মহারাজ ভেবে

কোনো কুলকিনারা পান না। চন্দ্রকেতুর ছেলে দুষ্মন্ত? সেই শয়তানের ছেলে? না-না-না—। এমনি সময় রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় কাঞ্চনমালা দুষ্টুমি করে ডাকেঃ কুহু! কুহু! কুহু!—কে? এমন করে গান গায়? এই জ্যোছনা রাতের বিজন ধারায় কে আমায় ডাকলো? মহারাজ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বাইরে নীল জ্যোছনা পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুমিয়ে আছে—সুন্দর নির্মেঘ আকাশ।

—কুহু! কুহু! কুহু!—আবার সেই গানের সুর ভেসে এলো।

মহারাজ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সামনের ঐ চন্দ্রমল্লিকার দিকে···একি সত্যি স্বপ্ন? না স্বপ্নের চেয়ে আরো আশ্চর্য গল্প?

—কুহু! কুহু! কুহু!—জয়সিংহের জয় হোক! ভোরের পাখীর মতো কাঞ্চনমালা গানের সুরে বললেঃ কুহু! কুহু! কুহু!

মহারাজ চেয়ে দেখলেন এক অপরূপ সুন্দরী নীল আকাশের পরী—গায়ে রূপোলি পাখনা দুটি চিক্‌মিক্ করচে। চাঁপাফুলের মতো ফুটফুটে রং—কাজলটানা চোখে স্বপ্নের আবেশ—স্বর্গের কোন্ পারিজাত বনের মেয়ে পথভুলে নেমে এসেচে এই মাটির

পৃথিবীতে ? পরীর দেশ—স্বপ্নের দেশ। তারা কোনোদিন আসে না এই আমাদের পৃথিবীর খেলাঘরে ! তবে ? মহারাজের চোখে পলক পড়ে না।

—আমাকে চিনতে পারচ না মহারাজ ? কাঞ্চনমালা বললে।

—কই না ? মহারাজ উত্তর দিলেন।

—আমি কাঞ্চনমালা। আকাশের তারাফুল আমাকে পাঠালে তোমার কাছে, তারা বললে—

—কী বললে ? মহারাজ ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করেন।

আকাশের তারাফুল বললে ঃ কী সুন্দর এই রাজপ্রাসাদ—কী সুন্দর এই তোমার দেশ রতনগড়—যাও বন্ধু ফিরে যাও সেই স্বপনপুরীতে······

—আমার দেশে তুমি আসবে কাঞ্চনমালা ? কে তুমি ? আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে, তুমি আসবে ?

—কেন, আমাকে আশ্রয় দেবে না ?—দুষ্টুমি করে হেসে কাঞ্চনমালা বললে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয় দেবো ! এসো ভাই এসো—আমার এই রতনগড় আজ ধন্য হবে—নীল আকাশের পরী এসেচে রতনগড়ে। —এসো—এসো আমার ঘরে······

কাঞ্চনমালা পাখ্‌না মেলে গান গাইলো। কী মধুর সেই

স্বপ্নময় গানের সুর! মহারাজ ঘুমিয়ে পড়লেন। আর ওদিকে বনমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা—বনমালার দল জেগে উঠলো। কাঞ্চনমালার গান শেষ হলেও সে-সুর তখনো বাতাসের পর্দায় রিন্‌রিন্ করে বাজচে।

কাঞ্চনমালা বললে: কিন্তু মহারাজ তুমি ছাড়া দুনিয়ায় একথা আর কেউ জানবে না!

—বেশ তাই হবে। মহারাজ কথা দিলেন।

—আমায় যদি কেউ, পৃথিবীর মানুষ যারা, লুকিয়ে দেখে নেয়, আমি সেই মুহূর্তে নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাব। কাঞ্চনমালা বললে।

—আজ থেকে তুমি আমার বন্দী: মহারাজ ডাক দিলেন—চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু!

—না-না মহারাজ, কাঞ্চনমালা বলে উঠলো: একমাত্র তুমি ছাড়া সাতরাজ্যের কোন লোক আমার কথা জানবে না। দিনে দিনে আমি আকাশবনে মিলিয়ে যাব, আর জ্যোছনা আলোয় নেমে আসব এই রতনগড়ের দেউড়ীতে······কেমন?

কিন্তু কে কার কথা শোনে? মহারাজ আনন্দে দিশেহারা হয়ে ডাক দিলেন: চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু! তোমরা সবাই শোনো! আমার রতনগড়ে আজ নীল আকাশের পরী কাঞ্চনমালা

এসেচে। সাত রাজ্যের মুক্তো মাণিক এনে তৈরী করেচি এই রাজপ্রাসাদ—কোন দেশের লোক এমন কথা শুনেচে? মানুষের ঘরে পরী আসে? ওগো তোমরা শোনো ঃ রতনগড়ের ইতিহাসে আজ এক স্মরণীয় দিন—তোমরা এসো—এসো—

মহারাজ পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

কাঞ্চনমালা মনের দুঃখে মলয়পুরের দিকে উড়ে চললো···

পরদিন ভোরে রতনগড়ে সাড়া পড়ে গেলো। দেশশুদ্ধু লোক অবাক হয়ে ভাবে ঃ এমন কথা কেউ কোনদিন শুনেচে?

মহারাজ আদেশ দিলেন ঃ চন্দ্রকেতু! সাতরাজ্যের লোককে খবর দাও—কাল থেকে রতনগড়ে আনন্দ-উৎসব শুরু হবে।

চন্দ্রকেতু অবাক হয়ে বললে ঃ সেকি মহারাজ!

মহারাজ বললেন ঃ আমার হুকুম। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে চাই না···

তারপর দলে দলে শিশু-কিশোর···ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে···আর এলো গরীব চাষা-মজুর, সেপাই-সান্ত্রী আর সওদাগর। সবাই আজ নিজের জীবনকে সার্থক করে নেবে!

মহারাজের আনন্দের সীমা নেই। সমস্ত জগতের লোক

যা—কোনোদিন জানেনি, শোনেনি—আজ তারা রতনগড়ে চলে আসুক……দেখে যাক এই আনন্দ উৎসব।

কিন্তু কাঞ্চনমালা কই?

চন্দ্রকেতু এদিকে দুষ্মন্তকে ডেকে বললেঃ আজ রাত্রেই কাঞ্চনকে সরিয়ে ফেলতে হবে…

দুষ্মন্ত অবাক হয়ে গেলো। বললেঃ কেন? তাতে আমাদের লাভ?

চন্দ্রকেতু বললেঃ তা হলে মহারাজ পাগল হয়ে যাবেন নিশ্চয়…আর সেই অবসরে…

বাকী কথাটা বুঝে নিলো দুষ্মন্ত।

সেইদিন ভোরবেলা রাজপ্রাসাদের দেউড়ীতে অসম্ভব রকম ভীড় জমায়েৎ হোলো। সেপাই-সান্ত্রী ছুটে এলো, হাতীশালার হাতী হেলতে-দুলতে মাহুতদের হাওদায় নিয়ে এলো…আর এলো মাথায় রঙীন পাগ্‌ড়ী-আঁটা দুরন্ত ঘোড়সওয়ার। সে একেবারে হৈ-হৈ কাণ্ড! রাজ্যের লোক এসে হাজির।

এমনি সময় মহারাজ সেই ঘরে এসে চমকে উঠলেন! সারা শরীর অবশ হয়ে এলো…চোখের পাপড়ি বুঁজে এলো…কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন সেইখানে। এও কি স্বপ্ন? মহারাজ

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুধু চেয়ে রইলেন কাঞ্চনমালার দিকে···
কিন্তু কাঞ্চনমালা কই ?

সেই সময় চন্দ্রকেতু এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরের মেঝেয় এক অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারীর পাথরের মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে আছে ! মহারাজের চোখে জলের বন্যা।

চন্দ্রকেতু মুখ টিপে হাসলো।

মহারাজ উন্মাদের মতো বললেন—ফিরে যাও চন্দ্রকেতু···আমার সামনে থেকে চলে যাও, বন্ধ করে দাও এই আনন্দ-উৎসব···যাও-যাও—!

চন্দ্রকেতু ফিরে এলো।

প্রহরী রাজফটকের কাছে এসে ঘোষণা জানালো ঃ মহারাজের হুকুম—সবাই ঘরে ফিরে যাও···উৎসব বন্ধ করো।

--কেন ?—কেন ? কি হোলো ? সবার মুখে এই এক প্রশ্ন।

প্রহরী শুধু বললে ঃ মহারাজের আদেশ। দেশ শুদ্ধু লোক কালো মুখ করে ঘরে ফিরে গেলো।

দিন নেই, রাত নেই—মহারাজ জয়সিংহ প্রলাপ বকেন ঃ কাঞ্চনমালা ! কাঞ্চনমালা ! চন্দ্রকেতু মনে মনে খুসী হয় বৈকি, অথচ বাইরে কিছু বলে না।

একদিন দুষ্মন্ত বললেঃ বাবা! মহারাজ পাগলের মতো দিনরাত ছুটে বেড়ান—আর ডাকেনঃ কাঞ্চনমালা! এই সুযোগ···

চন্দ্রকেতু বললেঃ না। আরো কিছুদিন যাক্। তারপর সাবাড় করা যাবে···! দুষ্মন্তের মনে আর আনন্দ ধরে না। এবার সে রতনগড়ের রাজা!

ফিরে এসো রতনগড় থেকে। মলয়পুরের পথে যেতে যেতে কাঞ্চনমালা ক্লান্ত হয়ে বসলো এসে এক বটছায়ার নীচে—। বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী, সেই নদীর ঘাটে বসে কাঞ্চনমালা গান গাইতে লাগলোঃ জাগো! জাগো! ওগো আমার বকুলবনের বন্ধুরা······। এদিকে বনের মাঝ বরাবার যে মেঠো-পথ এঁকে বেঁকে চলে গিয়েচে কোন্ এক অজানা তেপান্তরের মাঠের দিকে—সেই পথ দিয়ে ছুটে এলো এক ফুটফুটে নয়নতারার মতো মেয়ে—আদুল গায়ে বনফুলের মালা, কপালে রক্তচন্দনের টিপ্, মাথায় চাঁপার গুচ্ছ! একটুখানি মৃদু হেসে কাঞ্চনমালার গলায় পরিয়ে দিলো দোলনচাঁপার মালা। তারপর কচি হাত দুখানা কাঞ্চনমালার গলায় জড়িয়ে মধুর স্বরে বললেঃ

কি ভাই, আমায় চিনতে পারচ না? এই বলে হেসে উঠলো সেই বনের মেয়ে। কাঞ্চনমালা অবাক হয়ে জিগেস করলেঃ কে ভাই তুমি?

বনের মেয়ে বললেঃ আমি বনের মেয়ে, আমার নাম বনমালা। বনে বনে ফুলের মধু খেয়ে বেড়াই—আমার শুকনো পাতার খেলাঘরে মৌমাছিরা এসে গান গায়। তুমি যাবে সেখানে কাঞ্চনমালা?

—আমায় তুমি চিনলে কেমন করে? কাঞ্চনমালা অবাক হয়ে গেলো।

—তোমায় চিনব না? বা—রে! বনমালা হেসেই আকুলঃ অমন যার সোণার বরণ দুধে-আল্‌তা গায়ের রং—সেই তো কাঞ্চনমালা!

সেই শুনে কাঞ্চনমালা খুসী হয়ে বনমালার গলে সেই দোলন-চাঁপার মালা পরিয়ে দিয়ে বললেঃ আজ থেকে আমরা দুজন বন্ধু।

—উঁহু! বনমালা বললেঃ শুধু তাই বললে চলবে না। তুমি চলে গেলে আমি একা থাকব কি করে?

কাঞ্চনমালা বললেঃ রইলো এই দোলনচাঁপার মালা। সাতদিন সাতরাতের পর শুনতে পাবে সাত রাজ্যের চমক্-লাগা খবর। সেদিন আমায় ভুলো না বন্ধু?

—কি, কি খবর ? বনমালা ব্যাকুল প্রশ্ন জানালো।

—আজ বলব না। কাঞ্চনমালা হেসে বললে।

—কেমন করে জানব ভাই সেই সাত রাজ্যের খবর ?

—সে আমি জানি না। কাঞ্চনমালা আকাশের গায়ে মিশিয়ে গেলো।

সাতদিন সাতরাত মহারাজের চোখে ঘুম নেই।

নিঝুম রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, এক গভীর তারাভরা আকাশ··· দূরে নীল পাহাড়ের সারি প্রহরীর মতো ঝিমোয়, দেওদারের শুকনো পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোছনার রূপোলী আলো লুকোচুরি খেলে যায়। মহারাজের চোখে স্বপ্নের আবেশ···কাঞ্চনমালার কুহেলী স্বপ্ন ?

রতনগড়ে জনমানবের সাড়া নেই। গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন। শুধু মহারাজ জাগ্রত।

—কুহু ! কুহু ! কুহু ! রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় কে যেন দুষ্টুমি করে ডাকলো।

মহারাজ চমকে উঠলেন। এই নিশুতি রাতে কে এমন মধুরস্বরে গান করে ?

—কুহু! কুহু! কুহু! রতনগড়ে অকাল বসন্ত জেগেচে! আবার কে মিহিগলায় ডাকলো ঃ জাগ্রত হও বন্ধু—চোখ মেলে চাও।

মহারাজ চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন ঐ চন্দ্রমল্লিকার দিকে··· তাঁর স্বপ্ন সার্থক হোলো! রতনগড়ে আবার কাঞ্চনমালা এসেচে। আবার এলো ঐ নীল আকাশের পরী—ঐ শোনো তার সুললিত গানের সুরেলা···

মহারাজ আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন ঃ কাঞ্চনমালা! কাঞ্চনমালা!

—স্থির হয়ে দাঁড়াও। কাঞ্চনমালা বললে ঃ চুপ করে শোনো আমার কথা। আমার কাছে তুমি অপরাধী জয়সিংহ, সেকথা জানো?

—অপরাধী? মহারাজের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধুলোর মতো আকাশে মিলিয়ে গেলো।

কাঞ্চনমালা গম্ভীর সুরে বললে ঃ হ্যাঁ। তুমি মস্ত এক অপরাধ করেচ জয়সিংহ। সেজন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে। শোনো ঃ আকাশের পরীরা কোনোদিন মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে না। পথ ভুলে আমি এসেছিলাম রতনগড়ে—কথা ছিলো ঃ সাত রাজ্যের কেউ সেকথা জানবে না। সেকথা তুমি

শোনোনি—দেশময় সাড়া এনে দিয়েচ যে, রতনগড়ের রাজ-প্রাসাদে এসেচে কাঞ্চনমালা ! তাই সেই মুহূর্তে কাঞ্চনমালা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেচে···শুধু পড়ে আছে এক ভাঙ্গা পাথরের মূর্তি—সে আমার মূর্তি নয়—আমার প্রেতাত্মা। আমি জানি ঃ পৃথিবীর মানুষ অবহেলাভরে সুখস্বপ্নকে বিসর্জন দেয়, নির্বোধের মতো খেলাঘর রচনা করে। সেই ভুলের জন্য তোমাকে শাস্তি নিতে হবে জয়সিংহ।

—আমায় ক্ষমা কর, আমার মুক্তি দাও কাঞ্চনমালা ! মহারাজ অভিভূতের মতো বলেন।

—স্থির হও ! আমাদের দেশে ক্ষমা নেই ! আমরা ভালবাসি, স্নেহ করি, দয়া করি—আমরা প্রীতির ডালি নিয়ে কাজল ঘুমের আবেশ নিয়ে স্বপ্নসাগরে ভেসে বেড়াই, কিন্তু ক্ষমা করি না। অপরাধী চিরদিনই শাস্তি মাথা পেতে নেয় ! শোনো তবে ঃ বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী—। সেই নদীর পাশে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে বনের মেয়ে—বনমালা। আজ থেকে সাত বছর পরে তার গর্ভে যে রাজপুত্র জন্ম নেবে--সেই হবে রতনগড়ের আসল রাজা। আর দুষ্মন্ত···

--না-না দুষ্মন্ত নয়···সে শয়তানের বাচ্চা···। পাগলের মতো মহারাজ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। কাঞ্চন-

মালার শেষ কথাগুলো ভেসে এলো দূর থেকে: কিন্তু তার হাতেই তোমার মৃত্যু হবে...আর দুষ্মন্ত সেই রাজপুত্রের হাতেই নিহত হবে...সেদিন রতনগড়ে আবার আসব আমি আসব...

কিন্তু মহারাজ সেকথা জানলেন না।

সেই মুহূর্তে ডাক পড়লো অন্দরমহলে রাজমন্ত্রী চন্দ্রকেতুর। মহারাজ আদেশ দিলেন: শোনো চন্দ্রকেতু! বকুলবনের ধারে রূপবতী নদী, তার পাশে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে এক বনের মেয়ে—নাম তার বনমালা। আজ এই মুহূর্তে সেপাই নিয়ে গিয়ে তাকে আমার কাছে বেঁধে নিয়ে এসো—যাও—। চন্দ্রকেতু বললে: জো হুকুম মহারাজ।

মহারাজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন: যাও—এখুনি দুষ্মন্তকে পাঠাও বনমালাকে বন্দী করে আনবার জন্যে...যাও—যাও—। চন্দ্রকেতু সেলাম জানিয়ে চলে এলো সেখান থেকে।

মহারাজ ভাবচেন: কে এক বনের মেয়ে, তার ছেলে কিনা হবে এই রতনগড়ের রাজা? না-না, সে কোনদিনই হতে পারে না। কিন্তু এসব কথা সত্য হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কই? মহারাজ বিচলিত হয়ে পড়েন...অনর্থক বনমালাকে বন্দী করার

কোনো অর্থই তিনি খুঁজে পান না…তিনি আদেশ ফিরিয়ে নিতে যান…কিন্তু কোথায় চন্দ্রকেতু ?

এদিকে দুষ্মন্ত হুকুম শুনে মনের আনন্দে রওনা হোলো রূপবতী নদীর দিকে। নদীর ধারে পৌঁছুতে তার বেলা হয়ে গেলো—শিরশির ঝিরঝির বাতাস মাঝ-আকাশের বুকে বইতে শুরু হোলো। বনমালা সেই মেদুরসন্ধ্যায় ঘরে বসে দোলন-চাঁপার মালা পরে গুনগুন করে গান গাইছিলো…এমনি সময় রাজকুমার দুষ্মন্ত সেখানে গিয়ে হাজির।

—তোমার নাম বনমালা ? দুষ্মন্ত হেসে জিগেস করলে।

—কেন তুমি কোন্ দেশের লোক ? বনমালা অবাক হয়ে বললে।

. দুষ্মন্ত বললে ঃ আমি রতনগড়ের রাজকুমার। মহারাজের হুকুম ঃ রূপবতী নদীর ধারে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকে এক বনের মেয়ে, নাম তার বনমালা। সেই বনমালাকে চাই—রাজ-প্রাসাদে তোমার ডাক পড়েচে।

বনমালা আনন্দে নাচতে নাচতে বললে ঃ বেশ বেশ—চল, আমি যাব তোমার সংগে। দোলনচাঁপার মালা থেকে একটা চাঁপা ঝরে গেলো !

দুষ্মন্ত বনমালাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ফিরে এলো রতনগড়ে।

মহারাজ বনমালাকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন! বনের মেয়ের এমনি রূপ···আদেশ দিলেন: তুমি ভুল করেচ দুষ্মন্ত, আজ থেকে বনমালা রতনগড়ের মহারাণী! সাতরাজ্যের লোকদের ডাকো···আনন্দ-উৎসব চালাও, আবার রতনগড় জেগে উঠুক—!

বনমালা খুশীতে মহারাজের বুকে মুখ লুকোলে। কিন্তু দুষ্মন্ত চমকে উঠলো। মহারাজ একি করলেন? রাগে ঘৃণায় প্রতিহিংসায় তার চোখে মহাবন্যা এসে পড়লো।

মহারাজ ডাকলেন: চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু আড়াল থেকে সব শুনে নিয়েচে। মহারাজের সামনে এসে সেলাম জানালে। মহারাজ বললেন: যাও চন্দ্রকেতু, সবাইকে খবর দাও, কাল আবার রতনগড়ে আনন্দ-উৎসব স্বরু হোক্···আজ থেকে বনমালা রতনগড়ের মহারাণী···

চন্দ্রকেতু বললে: মহারাজ, আপনি কি বলচেন?

এবার উত্তর দিলো বনমালা: কিছু না মন্ত্রীমশায়! কাল রতনগড়ের রাজপ্রাসাদে শুভ-বাসর বসবে, তার আয়োজন করুন—

চন্দ্রকেতু কালোমুখ করে ফিরে এলো। না—এর প্রতিশোধ চাই! সেইদিন রাত্রেই চন্দ্রকেতু দুষ্মন্তকে ডেকে বললেঃ শোনো দুষ্মন্ত, আজ রাত্রির মধ্যেই বনমালাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে ফেলতে হবে। নয়ত কাল ভোরে সাত রাজ্যের লোক সব জেনে ফেলবে।

দুষ্মন্ত জিগেস করলেঃ কী করতে হবে বলুন।

চন্দ্রকেতু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেঃ আমাদের পূর্বদিকের ঐ সাতমহলা নীলকুঠিতে বনমালাকে বন্দী করে রেখে দাও—যেন সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে না পায়। তারপর—তারপর—প্রতিহিংসায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

সেই রাতেই দুষ্মন্ত মহারাজের ঘর থেকে ঘুমন্ত বনমালাকে বন্দী করে এনে সেই সাতমহলা নীলকুঠির সবচেয়ে উঁচু যে ঘর—সেই অন্ধকার ঘরে বনমালাকে বন্দী করে রেখে গেলো। আর মহারাজের বিছানায় একটি ছোট্ট কাগজের টুক্‌রো ফেলে দিয়ে চলে এলো চুপিচুপি—'মহারাজ, বনের মেয়ে কোনোদিন এতো সৌভাগ্যবতী হতে পারে না। বনমালা বনেই থাকতে চায়, রাজপ্রাসাদের কারাগারে আমার স্থান নেই। বিদায়!—বনমালা।'

দুষ্মন্ত আর চন্দ্রকেতু নিশ্চিন্দি হোলো। কিন্তু বনমালার

ঘুম ভাঙতেই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলো। ভাবলেঃ মহারাজের একি খেয়াল ? এমন করে আমায় বন্দী করার মানে ?

জ্যোৎস্না রাত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে নীল কুয়াসা জমে আছে। চারিদিকে রূপোলী আলোয় ঝলমল করচে। বনমালার চোখে তন্দ্রার ঘোর নেমে আসচে…এমনি সময় নীল আকাশের গায়ে ভাসতে ভাসতে কাঞ্চনমালা এসে ডাকলো—কুহু ! কুহু !! কুহু !!!

সেই ডাকে বনমালার ঘুম ভেঙে গেলো।

কাঞ্চননালা বললেঃ বন্ধু জাগো। আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো বনমালা—

বনমালা আনন্দে খুশী হয়ে বললেঃ কাঞ্চনমালা তুমি এসেচ ভাই—এদ্দিন পরে আমায় মনে পড়লো বুঝি ?

কাঞ্চনমালা হেসে ফেললো এবারঃ জানো ভাই, সাত সাগরের পারে গহন অন্ধকারে আছে এক মেঠো-পথ। সেই পথে যেতে যেতে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে…চলে যাবে কংকাবতীর দেশে। সেখানে আজ মহা ধূমধাম—কংকাবতীর দেশের রাজকুমার গন্ধরাজের হবে বিয়ে। দেশে দেশে খবর গেছে—স্বয়ংবরা হবে—

—স্বয়ংবরা ? বনমালা অবাক হয়ে গেলো।

কাঞ্চনমালা বললে ঃ হ্যাঁগো, স্বয়ংবরা হবে। এদেশে সবই এমনি আশ্চর্য কাণ্ড! এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। দেশ দেশান্তর থেকে আসবে রাজকন্যেরা সাতরঙা ময়ূরপংখী চড়ে—আমাদের সেই স্বয়ংবরা সভায়। আর গন্ধরাজ মুক্তোমালা পরিয়ে দেবেন কোনো এক রাজকন্যের গলে।

—কে সেই রাজকন্যে? বনমালা জিগেস করে।

—জানো না বন্ধু! সভার সবাই চমকে চেয়ে দেখবে, গন্ধরাজ তাঁর হাতের মুক্তোমালা পরিয়ে দিয়েচেন বনমালার গলে!

—ইস্! বনের মেয়ের অমন স্বপ্নে কাজ নেই।

—না-গো-না! কাঞ্চনমালা বনমালার হাত ধরে বললে ঃ ভয় নেই তোমার, দেখো গন্ধরাজ তোমার গলেই মালা দেবে। এসো, আমরা পালিয়ে যাই আজ কংকাবতীর দেশে—

—কেন?

—কাল ভোর হবার আগে দুষ্মন্ত তোমাকে মেরে ফেলবে জানো?

—আমার অপরাধ?

—কিছু নয় ভাই। রতনগড়ের মহারাণী হবে এক বনের মেয়ে—এ হেন শুভকথা তারা শুনবে কেন? দুষ্মন্ত মহারাজকে

সরিয়ে রতনগড়ের রাজা হতে চায়। তাই, তোমায় সরিয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভাবনার কথা নেই।

—কী জানি ভাই, আমার যেন কেমন ভয় করচে ঃ বনমালা ভীতকণ্ঠে বললে।

—এ ভাই শয়তানের দেশ। সেসব অনেক কথা···তোমায় পরে বলবো একদিন। এবার এসো—এই ফাঁকে আমরা পালাই।

এই বলে কাঞ্চনমালা বনমালাকে সংগে নিয়ে রওনা হোলো কংকাবতীর দেশে। আকাশের পশ্চিম কোণে পোহাতী-তারা দপ্‌দপ্‌ করে হাতছানি দিয়ে ডাকলো···এসো-এসো—

পরদিন ভোরবেলা রতনগড়ে ভয়ানক রকম সব কাণ্ড ঘটে গেলো।

মনের আনন্দে দুষ্মন্ত যখন চন্দ্রকেতুর দেওয়া চক্‌মকে ছোরাখানা নিয়ে এসে হাজির হোলো নীলকুঠির অন্দরমহলে—তখনও চারদিকে অন্ধকারের গাঢ় ছায়া আর বিদায়-রাত্রির আকাশ গম্ভীর। দুষ্মন্ত ভাবলে ঃ আর ভয় কী? আজই বনমালার জীবন শেষ হয়ে যাবে তার ছোরাখানার আঘাতে। কিন্তু কী আশ্চর্য! নীলকুঠির সাতমহলা বাড়ীর সবচেয়ে উঁচু ঘরে দুষ্মন্ত এসে দেখলো—ঘর একেবারে শূন্য—বনমালা নেই!

সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো থরথর করে—সবাই যেন এক সংগে জোট পাকিয়ে হেসে উঠলো ঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—!

—তবে বনমালা সত্যিই নেই ? কিন্তু পালালো কেমন করে ? কে তাকে পথ দেখালে ? দুষ্মন্ত ভেবে কোন কূলকিনারা পেলো না। খবর এলো, নীলকুঠিতে বনমালাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চন্দ্রকেতু সেইকথা শুনে ক্ষেপে উঠলো ঃ না-না-দুষ্মন্ত ! বনমালাকে আমার চাই। তাকে এবার নিজের হাতে হত্যা করবো।

এদিকে রতনগড়ের রাজপ্রাসাদে আর এক অভাবনীয় কাণ্ড ! মহারাজ জয়সিংহ ভোরে উঠে দেখেন বনমালা নেই ! কোথায় গেলো বনমালা ? রাজ্যময় আবার সাড়া পড়ে গেলো। বনমালা কোন্ দেশে উধাও হোলো ? মহারাজ উন্মাদের মতো এবার শুধু ডাকেন ঃ বনমালা ! বনমালা ! হঠাৎ একদিন তাঁর মনে কি রকম সন্দেহ জাগলো। ডেকে পাঠালেন চন্দ্রকেতুকে। জিগেস করেলেন ঃ চন্দ্রকেতু, বনমালা কোথায় তুমি জানো ?

চন্দ্রকেতু নীরব।

মহারাজ জলদ-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন ঃ চন্দ্রকেতু, বলো—নিশ্চয় তুমি জানো বনমালা কোথায় আছে ?

চন্দ্রকেতু তবু নীরব।

শেষে অধীর হয়ে মহারাজ বললেন : বলো চন্দ্রকেতু—তোমায় অনুরোধ করচি আমি···

চন্দ্রকেতু এবার শুধু বললে : আমি জানি না মহারাজ!

—নিশ্চয় জানো শয়তান! বলো, বনমালা কোথায়? নয়ত কারাগারে বন্ধ করে রাখবো—বলো—বলো চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু যেন এবার সচেতন হোলো, নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। দুষ্মন্তও বুকের আড়ালে ছোরাখানা বাগিয়ে ধরে শুধু সংকেতের অপেক্ষায় চুপ করে রইলো। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়···চন্দ্রকেতু নীরব অবনত মুখে শুধু সুযোগ খোঁজে।

মহারাজ ডাকলেন : এই কে আছে এখানে, চন্দ্রকেতুকে বন্দী করো!

কিন্তু কোনো প্রহরীর বদলে মহারাজের দিকে ছুটে এলো ছোরা হাতে দুষ্মন্ত, আর চন্দ্রকেতু সেই অবসরে ঘরের আলো দিলে নিভিয়ে! মহারাজ বাধা দিলেন : চোপ্ রও শয়তান··· কিন্তু তার আগেই দুষ্মন্ত তার চকচকে ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিয়েচে মহারাজের বুকে···আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মহারাজ···

তার পরদিন চন্দ্রকেতু দেশময় রাষ্ট্র করে দিলো যে, জয়সিংহ মারা গেচেন। আবার রতনগড়ে একদিন নহবৎ

বাজলো—আনন্দ-উৎসব চললো……সবাই সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো: রতনগড়ের রাজা দুষ্মন্ত। আর মহারাজ জয়সিংহের সমাধির উপর লেখা এই বাণী:

কাঞ্চনমালা উধাও হোলো কোন্ আকাশের গায়?
বনমালার মৃত্যু হোলো সাগর কিনারায়!

একটুখানি দাঁড়াও ভাই—কংকাবতীর দেশে আজ উৎসব হবে, তার আয়োজন করতে হবে আমায়।…এবার এসো…

গন্ধরাজ হলেন কংকাবতীর সাতরাজার মাণিক। বনমালাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন—অমন সুন্দরী রাজকন্যে তিনি নাকি জীবনে দেখেননি। কিন্তু বনমালা যে বনের মেয়ে গো? তা হোক্—

কাঞ্চনমালা বনমালার চিবুক নেড়ে বললে: কেমন? এবার তুমি বন্দী……

—যাও দুষ্টু কোথাকার।

মহা সমারোহে বনমালার সংগে গন্ধরাজের বিয়ে হোলো। আনন্দ ও হাসিতে কেমন করে সাতটি বছর কেটে গেলো, সে-গল্প আরেকদিন বলবো। আজ বনমালা খুব খুশী—কেন জানো?

ওমা, তার কোলে ফুটফুটে ঐ ছোট্ট ছেলেটি কেগো ? গন্ধরাজ তার নাম দিয়েচে : চঞ্চলকুমার।

কাঞ্চনমালা বলে : বড় দুষ্টু ছেলেটা। কিন্তু দুষ্মন্তের কথা মনে পড়তেই বলে ওঠে : না—রাজকুমার নির্ভীক হওয়া ভালো।...

সাতটি বছর পরে...

কাঞ্চনমালা গন্ধরাজ, বনমালা আর চঞ্চলকুমারকে সংগে নিয়ে এলো রতনগড়ে। ঝুপ্‌সী নদীর ধারে দেখা হোলো এক অতি দীনহীন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সংগে। এক সুদীর্ঘ বটছায়ার কোলে বৃদ্ধ ভিক্ষুক অতি ধীরে ধীরে এই কথা বললেন : আমায় ক্ষমা করো কাঞ্চনমালা—আমায় মুক্তি দাও !

কাঞ্চনমালা সেই শুনে তাঁকে চিনলো। বললে : মহারাজ, আমরা আজ তোমার দেশে এসেচি—এই গন্ধরাজ আর এ চঞ্চল-কুমার, রতনগড়ের ভাবী রাজকুমার।

মহারাজ জয়সিংহ বললেন : বড় দেরীতে এসেচ মা ! সন্তান চিরদিনই ভুল করে, সেজন্য কি ক্ষমা নেই ? আজ সাতটি বছর ধরে তোমাদের অপেক্ষায় বেঁচে আছি। দুষ্মন্ত আর চন্দ্রকেতু

আমায় হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি। আজ দুষ্মন্ত রতনগড়ের রাজা বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে যাও—প্রজারা পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়ায়—সারা দেশময় একটা আতঙ্ক। চন্দ্রকেতু আমার সংগে শয়তানি করেচে—তার প্রতিফলও সে পেয়েচে। ঐ দুষ্মন্ত সন্তান হয়ে চন্দ্রকেতুকে কারাগারে বন্দী করে তিল তিল করে বধ করেচে···আজ আমার দিন শেষ হোলো···এসো চঞ্চল, তোমার ললাটে জয়ের আশীষ এঁকে দিই।···

মহারাজ চিরনিদ্রিত হলেন। তারপর ?

তারপর সেই খবর সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। প্রজারা ক্ষেপে উঠলো। গন্ধরাজ রতনগড়ে এসে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দুষ্মন্ত এদিকে মহাবিপদে পড়লো। আজ চন্দ্রকেতু নেই, কে তাকে সাহায্য করবে ? অগত্যা বিনাযুদ্ধে সে রতনগড় ছেড়ে দিলো ভয়ে। আজ সাতবছর পরে চঞ্চলকুমার হোলো রতনগড়ের নোতুন রাজা।

—কিন্তু কাঞ্চনমালা কই ? বনমালা তাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে গেলো।

আর দুষ্মন্তকে টেনে নিয়ে উন্মত্ত প্রজারা পথের মাঝখানে

ফাঁসিকাঠে লটকে দিলো চঞ্চলের আদেশে। পাপের শাস্তি সে ভোগ করলো।

—কিন্তু কাঞ্চনমালা কই ?

চঞ্চলকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে বেরিয়ে পড়লো কাঞ্চনমালার উদ্দেশে···মলয়পুরের পাহাড়ের ধারে রক্তপলাশের বন···সেই বনের চপল-ঝর্ণার একপাশে সবুজ ঘাসের স্বপ্নশয্যা··· সেখানে এসো আমার সংগে···আস্তে আস্তে পা ফেলো··· কাঞ্চনমালার ঘুম ভাঙিও না। সেই সবুজ গল্প—সবুজ এক স্বপ্নদেশ তোমাদের ডাকেঃ কুহু! কুহু!! কুহু!!! এসো-এসো-এসো—!

দুই

মধুকমালার দেশে

—আর কতদূর ?

—অনেক—অনেক দূর—দেশান্তরের মাঠ বন পাহাড় পেরিয়ে মধুকমালার দেশে···

—আর যে পারচি না ভাই—আর কতদূর যেতে হবে আমায় ?

—আর কতদিন আমায় পথ চলতে হবে ?

—অনেক-অনেকদিন—ভোর হবার আগে তোমার যাত্রা শুরু, আর পৃথিবী থেকে দিন মুছে যাবার আগে তোমার যাত্রা-শেষ···তোমায় চলতে হবে, তুমি দুরন্ত চরনিক···তোমার দিকে চেয়ে আছে দেশ—দেশান্তের পায়ে হাঁটা পথ···

ঘুম ভেঙ্গে গেলো মাইলির। ঘুম থেকে জেগে উঠে মাইলি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো। এমন সুন্দর ভোর সে কোনো-দিন দেখেনি, জীবনে এই প্রথম সে এমন সোনালী ভোর দেখলো। দূরে পাহাড়ের গায়ে সূর্যের আলো ঝল্‌মলিয়ে উঠেচে, রামধনুর

মত সাতরঙে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেচে। পৃথিবী এমন স্থন্দর? মাইলি সূর্যকে প্রণাম করলো—।

মাইলি যাবে মধুকমালার দেশে···যেখানে সবুজ দেশ···যে-দেশে মেঘ আর সোনালী কুয়াসা···যেখানে ঘুমিয়ে আছে সবুজ রাজপুত্র আর কুঁচবরণ রাজকন্যার—মেঘবরণ চুল···সাত ঘোড়ার গাড়ী আর হাওয়ায় ভাসা সোনার চতুর্দোলা···মাইলি যাবে সেই দেশে, যাবে মধুকমালার দেশে···!

সাতদিন পথে কেটে গেছে মাইলির। পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ে মাইলি স্বপ্ন দেখছিলো—এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলো তার। কে এমন বাঁশীর স্থরে কথা কয়? ঘুম থেকে জেগে তার পাশে মাইলি যাকে দেখলো তাকে তোমরা চেনো? মাইলির হাত ধরে সে মুখ টিপে হাসতে লাগলো, কি স্থন্দর হাসি। মাইলির যেন চোখ জুড়িয়ে যাবে!

—কুহু! কুহু!

—কে তুমি? মাইলি তাকে আশ্চর্য হয়ে জিগেস করলো।

—আমি কাঞ্চনমালা, নীল আকাশের পরী। সে বললো।

—কাঞ্চনমালা? তোমাকে যেন কোথায় আগে দেখেচি?

—আমাকে দেখেচ রতনগড়ে।

—আর যেন কোথায়?

—আর যেখানে সবুজ দেশ, মধুকমালার দেশ···

—সে দেশ কোথায়? .আমি যাব সেই দেশে? মাইলি খুব আগ্রহভরে বললো।

—সে দেশ কোথায় আমি তোমায় বলবো না মাইলি।

—কেন?

—তুমি কি আমার বন্ধু? কাঞ্চনমালা হাসতে হাসতে বললো।

—হ্যাঁ, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু যে আমাকে নিয়ে যাবে মধুকমালার দেশে···

—ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখো—ঐখানে আছে তোমাদের সেই আলোময় দেশ—এসো আমার সংগে, ধরো আমার হাত, চলো সেই দেশে···

মাইলি আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো ঐ কোণে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলচে···তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে···!

—কুহু! কুহু!! এসো এসো—

পায়ে হাঁটা পথ···

পথের শেষ নেই···

মাইলির মনে হোলো যেন এ যুগ যুগান্তের পথ, কোনদিন

এর শেষ হবে না। কত দেশ, কত মাঠ বন পাহাড় পার হয়ে, এক দেশ থেকে আর এক স্বপ্নলোকের দেশে সে এসেচে আর ফিরে গেছে···কিন্তু তবু কোথায় সেই মধুকমালার দেশ ? ধূ ধূ করে কখনো তেপান্তরের মাঠ, খাঁ খাঁ করে বিষ্ণুপুরের বিল···বটের ছায়ায় ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীরা ঘুমিয়ে পড়ে। মাইলি তাদের সবাইকে চেনে। কিন্তু তাদের সংগে বসে থাকলে তার চলবে কেন ? সে যে যাবে মধুকমালার দেশে···

—আর কতদূর ভাই ? আমি আর পারচি না—মাইলি বসে পড়লো গাছের ছায়ায়। সামনে ছোট্ট একটা ঝর্ণা, নেচে নেচে গান করচে কারা সেখানে, সোনা-রাঙা তাদের গায়ের রং—মাছের মত হাল্‌কা দেহ, প্রজাপতির মত পাখ্‌না-মেলা। মাইলি আনন্দে নেচে উঠলো। তবে কি তারা এসে গেছে মধুকমালার দেশে ?

—আর কতদূর ?

কাঞ্চনমালা মাইলিকে বুকে জড়িয়ে বললে : বন্ধু, ঐ ঝর্ণার বুকে খেলা করচে জলপরীরা—তারা আমার বন্ধু। ওদের যদি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো, তাহলে তুমি যেতে পাবে সেই দেশে যেখানে সবুজ রাজপুত্র আর কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল···

—আর তুমি যাবে না আমার সংগে? মাইলি জানতে চাইলো।

—না আমি যাবো না মাইলি।

—কেন? কেন? মাইলি কাঞ্চনমালার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো।

কাঞ্চনমালা বললেঃ কাঁদে না মাইলি, ওদের দেশে তুমি চলে যাও! পথে যেতে যেতে যখন তুমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন আমি আবার আসব তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে। আমি যে তোমার বন্ধু ভাই—এই বলে কাঞ্চনমালা মিলিয়ে গেলো নীল আকাশের গায়—।

ঝর্ণার দিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেলো মাইলির! কি সুন্দর জলপরীদের গায়ের রং! কেমন সবাই সাঁতার কাটচে আনন্দে, এখানে দুঃখ নেই, বেদনা নেই, অন্ধকার নেই—শুধু হীরা-মানিক-জ্বালা আলোক মালা…এতো আলো, কোথায় আছে এমন আলো? সেইখানে বসে পড়লো মাইলি ঝর্ণার পাশে। আজ কি সুন্দর ভোর! গাছের পাতায় পাতায় সোনার আলো

ঝিক্‌মিক্ করচে। গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে শুরু করলো মাইলি—সেই যে গানটা সে সবচেয়ে ভালোবাসে…

আমি যে হারিয়ে যাবো মধুকমালার দেশে,
কোন্ অচীন্ পথের শেষে।
সন্ধ্যাবেলা তারার মালায় আমার গানের সুরে,
ভেসে বেড়াই আকাশ পথে কোথায় অচীন্‌পুরে।
যেথা আকাশ এসে মাটীর সাথে
কখন্ গিয়ে মেশে,—
আমি যে পালিয়ে যাবো মধুকমালার দেশে—
তোমায় হঠাৎ ভালোবেসে!

চারদিক কি নিঃঝুম। এমন সুন্দর ভোর বেলা, কোথাও কেউ নেই কেন? মাইলি ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। ঝর্ণার দিকে চেয়ে দেখে সেখানে কেউ নেই, স্বচ্ছ জলধারা সূর্যের আলোয় ঝল্‌মল করচে। জলপরীরা গেল কোথায়? তবে কি তারা মাইলির গান শুনে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েচে? মাইলি খুশি হয়ে ওঠে,—কেমন সুন্দর আর যাদু-ভরা তার ঘুম-পাড়ানি গান।

চুপ করে বসে আছে মাইলি। বেশ যেন ভালো লাগচে এই রকম বসে থাকতে ঝর্ণার কোলে পা ঝুলিয়ে। ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লো মাইলি···কত কি সে ভাবচে—কি ভাবচে বলো ত? ভাবচে মধুকমালার দেশের রাজপুত্র--

—যাও ভারি দুষ্টু, তোমরা! মাইলি সেকথা ভাববে কেন? অমন সুন্দর মেয়ে—চাঁদের মত ফুটফুটে, শিউলি ফুলের মত আলো-করা মেয়ে মাইলি। তবে সে কি ভাবচে?

এমন সময় সামনের ঝর্ণা থেকে হঠাৎ কে যেন গান গেয়ে উঠলো। গান নয়—যেন মোহন বেণুর স্বর! চেয়ে চেয়ে মাইলির চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসচে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে এক পরমা সুন্দরী জলপরী—স্বপ্নলোকের রাজকন্যা! মাইলির কাছে এসে তার হাত ধরে সে বললে: এসো ভাই, তোমাকে আমার রাজ্যে নিয়ে যাই।

মাইলি অবাক হয়ে জিগেস করলো: কোথায় তোমার রাজ্য?

—মধুকমালার দেশে!

—মধুকমালার দেশ? আনন্দে নেচে উঠলো মাইলি—আমাকে নিয়ে চলো সেই দেশে।

—আমায় তুমি কি দেবে? জলপরী হেসে হেসে বললো।

—তোমায় কি দেব ?—এই বলে মাইলি জলপরীকে বুকে জড়িয়ে তার গালে একটা চুমু দিলো !

জলপরীর হাত ধরে মাইলি চললো মধুকমালার দেশে··· হাজার রঙের রংমশাল যে-দেশে একসংগে জ্বলে ওঠে, —সপ্ত-যোজন দূরে সপ্তডিঙ্গায় চড়ে মাইলি চললো তার স্বপ্নদেশে···

মধুকমালার দেশ···

বিরাট প্রাসাদ সামনে,—সবুজ রাজপুত্র থাকে সেখানে। ফুলের দেশ—হাজার রঙের ফুল ছড়ানো তার বাগানে বাগানে, গাছের ডালে ডালে···রাজপ্রাসাদের পাশে মস্ত এক মহুয়া বন, স্বপ্নঝিল, আর সেখানকার ময়ূরপঙ্খী দেখলে সত্যিই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। জ্যোছনা রাতের শেষে সেই স্বপ্নঝিলে কুঁচবরণ রাজকন্যা জলবিহারে বের হন, সংগে থাকেন তাঁর একশো সখী, চাঁদের আলোয় ময়ূরপঙ্খী দুলে দুলে এগিয়ে চলে। মহুয়াবনের গন্ধ আকাশ বাতাস মাতিয়ে তোলে···সেখানে মৌমাছিদের ভিড় লেগে যায়···রাজপুত্র বসে বসে গান শোনে, রাজকন্যা গান করেন।

জলপরী রাজপ্রাসাদের সামনে এসে মাইলিকে বললো ঃ ঐ যে দূরের মহুয়া বন—ঐখানে রাজপুত্র বসে আছে তার সাধের রাজকন্যার আশায়। যখন রাত গভীর হবে, চাঁদ উঠবে আকাশে, তখন সোনার ময়ূরপঙ্ক্ষী চড়ে আসবেন কুঁচবরণ রাজকন্যা গান গাইতে গাইতে, রাজপুত্র তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চোখের জল ফেলবে। সারাদিন তাদের দেখা হয়না, শুধু রাত্রি বেলায় তাদের মধু-মিলন হয়। সমস্তদিন ঐখানে মহুয়া বনে চুপ করে বসে থাকে রাজপুত্র···

মাইলি চললো সেই মহুয়া বনের দিকে···সবুজ ঘাসের ওপর ভোরবেলাকার শিশির ঝিকমিক করচে, কয়েকটা ঝরে-পড়া মহুয়া পড়ে আছে এখানে-সেখানে। জলপরী আর মাইলি দাঁড়ালো সেই বনের ধারে।

রাজপুত্রের চমক ভাঙ্গলো। কার স্বপ্ন দেখচে রাজপুত্র বলতে পারো ?

—চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও—যাও—চীৎকার করে রাজপুত্র হঠাৎ কেঁদে ফেললো। মাইলি তার পাশে গিয়ে বসে পড়লো। পরম স্নেহভরে তার একখানা হাত নিজের হাতের

ওপর তুলে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললো ঃ রাজপুত্র, অনেক দূর দেশ থেকে এই তোমার মধুকমালার দেশে এসেচি, আমার কত আনন্দ। তোমাকে দেখবার জন্য আমার মন কত কেঁদেচে কিন্তু তুমি কাঁদচ কেন ?

রাজপুত্র শুধু করুণ চোখে মাইলির দিকে চেয়ে রইলো।

জলপরী হেসে বললো ঃ তোমার চোখের জলে এমন ফুলের দেশ যে ভেসে যাবে ভাই।

রাজপুত্র এবার কথা বললো ঃ আমি যে কেন কাঁদচি, সেকথা যদি জানতে তাহলে তোমাদের কাছে পৃথিবী চোখের জলে অন্ধকার হয়ে যেতো। আমি যে সব হারিয়েচি !

মাইলি জিগেস করলো ঃ কি হারিয়েচে তোমার ?

রাজপুত্র বললো ঃ যা হারিয়েচে সে আর ফিরে পাওয়া যাবে না !

মাইলি বললো ঃ আগে শুনি তোমার কাহিনী···

—বেশ শোনো।

অনেকদিনের কথা। সব মনে নেই। যেটুকু মনে পড়ে

সেকথা ভুলতে পারি না···মনের সাধ ছিলো দেশ দেখতে যাবো। দেশ-দেশান্তর পার হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবো তার ভেতর। অনেক দিনের সাধ আমার। একদিন পক্ষীরাজ সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অজানার দিকে, আকাশে সেদিন দেখেছিলুম শুকতারা জ্বলচে দপদপ করে। তারপর কত দেশ কত নদী পাহাড় আর তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে এলাম এই মধুকমালার দেশে—। এসেই শুনতে পেলাম এদেশের রাজকন্যার কথা। জ্যোছনা রাতে তিনি স্বপ্নঝিলে ময়ূরপঙ্খী চড়ে বিহার করেন আর গান শোনান তাঁর একশো সখীদের আমোদ করে। প্রতিজ্ঞা করলাম রাজকন্যাকে সংগে নিয়ে দেশে ফিরবো।

রাজকন্যা সেকথা শুনে হেসেই আকুল। আমায় ডেকে পাঠালেন তাঁর অন্দর মহলে। বীরের মত হাতে তলোয়ার নিয়ে আমি গেলুম রাজকন্যার কাছে। তাই দেখে রাজকন্যা তো ভয়েই অস্থির! অভয় দিলাম তাঁকে—আমি বীর, তাই এই আমার সাজ। সেকথা শুনে রাজকন্যা নেমে এলেন সোনার পালঙ্ক থেকে, আমার হাতে দিলেন একটি মহুয়া ফুলের মালা। প্রণাম করলেন আমার পায়ে। আনন্দে রাজকন্যার হাত ধরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম আমি—মহুয়া ফুলের মালা পরিয়ে দিলুম তাঁর গলায়। চুপি চুপি রাজকন্যা বললেন ঃ দিনে

আমার দেখা পাবেনা, জ্যোছনা রাতের শেষে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়বে, তখনই আমাকে পাবে ঐ মহুয়া বনের পাশে—

—আমার দেশে তোমায় নিয়ে যাবো।

—না, আমি যেতে পারব না।

—কেন ?

রাজকন্যা বললো ঃ মধুকমালার দেশ ছেড়ে আমার যাবার উপায় নেই ! তাহলেই আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার জন্ম এই দেশে, এই মাটিতে—এই দেশ ছেড়ে আমি পরের দেশে যাবো না !

তারপর প্রতিদিন জ্যোছনা রাতের শেষে আমাদের মিলন হয়। যেদিন চাঁদ ওঠেনা, সেদিন আমি শুধু বসে বসে কাঁদি আর চোখের জলে বুক ভেসে যায়। কতদিন…কতরাত কেটে গেছে তারপর ঠিক মনে নেই।…আজ রাজকন্যাকে আমি হারিয়ে ফেলেচি…আর সে আসবে না জ্যোছনারাতে আমার বুকে…

রাজপুত্র কাঁদতে লাগলো। মাইলি জিগেস করলো ঃ কেন তাকে হারালে ?

রাজপুত্র বললো ঃ একদিন অমনি এক জ্যোছনা রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ঐ দূরের মহুয়াবনে। রাজকন্যা গান গেয়ে

আমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। তাই অভিমানে ময়ূরপঙ্ক্ষী সমেত স্বপ্নঝিলে ডুব দিয়েচেন, আর আসবেন না। ঐ তার শেষ চিহ্ন পড়ে আছে স্বপ্নঝিলের মাঝখানে।

রাজপুত্রের চোখে জল। মাইলি এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললো।

হঠাৎ কে যেন দূরের মহুয়া বনের পাশে খুব জোরে হেসে উঠলো। রাজপুত্র চমকে ওঠে চেয়ে দেখে সামনের মহুয়া বন থেকে বেরিয়ে আসচেন রাজকন্যা। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য হোলো মাইলি। জলপরী কি তবে সেই মধুকমালার রাজকন্যা?

রাজকন্যা দূর থেকে হাত নেড়ে বললো: আমায় যে চায় সে অমন করে রাতদিন কাঁদে না। আমাকে সারাজীবন ধরে খুঁজলেও তোমরা আর পাবে না। মধুকমালার দেশ থেকে আমার যাবার হুকুম ছিলো না এতদিন, অভিশাপ দিয়ে ছিলেন দেবতারা। আমি স্বর্গের দূতী—তোমাদের পৃথিবীতে আমার স্থান নেই···

রাজকন্যা আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেলো, হাতে তার মহুয়া ফুলের মালা। রাজপুত্র পাগলের মত ছুটলো সেইদিকে, দেখতে দেখতে তার পক্ষীরাজ মিলিয়ে গেলো কোথায় কে জানে!

—কুহু! কুহু!—জাগো ভাই, জাগো!

ঘুম ভেঙ্গে গেলো মাইলির। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে মাইলি দেখলো ঠিক সেই ঝর্ণার পাশে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই কে তাকে ডাকচে। এসেচে কাঞ্চনমালা তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে।

কাঞ্চনমালা বললো: চলো—আমরা যাই এবার আর এক দেশে।

মাইলি তার দিকে চেয়ে বললো: কিন্তু মধুকমালার সেই রাজকন্যা?

কাঞ্চনমালা দেখিয়ে দিলো আকাশের দিকে: ঐখানে ঘুমিয়ে আছে সেই রাজকন্যা।

আশ্চর্য হয়ে মাইলি চেয়ে দেখলো আকাশের একদিকে একটি শুকতারা দপদপ করে জ্বলচে, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকচে পৃথিবীর সমস্ত রাজপুত্রদের…

ময়নামতীর দেশ

মধুকমালার দেশ পেরিয়ে
অনেক-আশার-দেশে
চললো আমার সপ্তডিঙ্গা
গভীর রাতের শেষে।
তোমরা চলো!
তোমরা এসো!
কোথায় যেন ডাকচে দূরের
সূর্য-রাঙা মন
—ময়নামতীর দেশে!

অনেক-আশার দেশে

রূপনাট্য

চম্পাবতী
পারুলদিদি
ফুলপরী
শুক ও সারী
বুলবুলি
মেঘকন্যা
স্বপনকুমার
মৃত্যু

[ভোরবেলাকার সোনারাঙা রোদ দিক্-ছোঁয়া মাঠ-বন-নদীর জলে ঝল্মল্ করচে। দূরে—অনেক দূরে গান গাইচে ভোরের পাখীরা, সে-সুর আকাশে বাতাসে ভেসে আসচে। সবুজ মাঠ, সবুজ স্বপ্ন আর সবুজ দেশ! ভোর হবার সংগে সংগে সাড়া জাগলো বনে বনে, আকাশে মাটীতে। সাগর পারের দেশে যে-বকুলবন, সেখানকার জীর্ণপুরীর এখনো ঘুম ভাঙেনি। সবুজ-রাঙা চাঁপাফুলেরা বুঝি ঘুমন্ত-স্বপ্ন দেখচে? আকাশ থেকে তাই আস্মানি রঙের সুরে গান গাইতে গাইতে নেমে এলো ফুলপরী। গান গেয়ে গেয়ে ডাক দিলো বকুলবনের চম্পাবতী-কে। পৃথিবীতে জাগলো সাড়া, বাজলো বাঁশী, জাগলো সুর......]

ফুলপরী—কই আমার বকুলবনের চম্পাবতী ? ভোর হোলো ঃ
এবার এসো গানের সময় যে বয়ে যায় !

[একটু খানি পরে]

—ও-ভাই কনকচাঁপা ! তোমাদের পারুলদিদি কই ?

পারুলদিদি—[গানের সুরে] সাত ভাই চম্পা বন্দী পারুল—

ফুলপরী—ভোরের আলোয় তোমার সে-জীবন মুছে যাবে পারুল,
এসো—

পারুলদিদি—কে ভাই আমায় এমন করে ডাকে ?

চম্পাবতী—[চোখ মেলে] জানো না দিদি, ও আমার মৌ-
বন্ধু—নীল আকাশের ফুলপরী !

ফুলপরী—চোখ মেলে চাও। ভোরের আলো তোমার জন্যে
এনেচে নোতুন ডালি ! জাগো জাগো, আমার সবুজ
বন্ধুরা !

[ভোরের গান]

বকুলবনের চম্পাবতী জাগো
প্রভাত বেলার সুর লেগেচে বনে,
ও-ভাই সেথা স্বপনকুমার আছে
রামধনু-রং গান গেয়ে যায় মনে।

জাগো জাগো ও-ভাই পারুল
আকাশ বনের মৌমাছি-ফুল
নোতুন দেশের আশার-বাণী শোনো ঃ
আসবে নাকি বন্ধু, আমার সনে

চম্পাবতী—যাবো-যাবো ! তোমার নোতুন দেশের আশার-বাণী কী ভাই ? আমায় শোনাওনা !

পারুলদিদি—আর আমি যদি মৌমাছি-ফুল, তুমি আমার প্রাণের সই। কেমন ? এবার বলো ঃ তোমার নোতুন দেশের রূপকথা।

চম্পাবতী—জ্বালো নোতুন আশার রংমশাল !

ফুলপরী—সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে আছে এক অতসীর বন। সেখানে নানা রঙের প্রজাপতি ঘুমপাড়ানি গান গায় আর শুধু হাসে। সে দেশে আছে শুক ও সারী, আর আছে বুলবুলি-ভাই। সেখান থেকে একটুখানি সোজা চলে যাও পূবদিকে—দেখতে পাবে মেঘকন্যার দেশ। আর পাবে স্বপনকুমার-কে। সে তোমাদের জন্যে কাঁদে, আর বলে ঃ এই আমার মেঘকন্যার দেশ,

এমন স্বপ্ন-দেশ, এমন জ্যোছনা, এমন নিবিড় ঘুম আর ঝর্ণা-ফুলের গান হারানো কথার সুর আর কোথায় আছে! ওগো আমার বকুলবনের চম্পাবতী। এসো —আমার অনেক-আশার-দেশে!

চম্পাবতী—কে ভাই এই স্বপনকুমার আমার জন্যে এমনভাবে কাঁদে?

পারুলদিদি—সেই অনেক-আশার-দেশ কোথায়?

ফুলপরী—সে তোমাদের নীল আকাশের স্বপ্নগান···দিনের সীমানা পার হয়ে রাতের চাঁদ যে দেশে ডুবে যায়, সেইখানে আছে অনেক-আশার-দেশ। যাবে সে দেশে?

চম্পাবতী—হ্যাঁ ভাই যাবো—নিশ্চই যাবো। আমার মন বলচে ঃ চলো-চলো-আরো এগিয়ে চলো······

পারুলদিদি—[হেসে] আমায় সঙ্গে নেবে নাকি সই? আমিও তোমার সাথী হবো।

ফুলপরী—বেশ, এসো।

[পথের গান]

দূরের আলো ডাক দিয়েচে তরীর বাঁধন খোলো,
এই আকাশের আলোর পথে বন্দনা কার হোলো।

আশার-বাণী আমার বুকে
গানের সুরে ঘুমায় সুখে,
সেই দেশেরই নীল-সায়রে স্বপ্ন আমার ভোলো ॥
নোতুন দেশের মোহন বাঁশী
ঢেউ দিয়ে যায় বক্ষে আসি
শুনচে কি মোর স্বপনকুমার সেথায় নিয়ে চলো।
মুক্ত করো জীবন আমার মধুর করে তোলো ॥

[জ্যোছ্‌নার ছায়া-ঘেরা পথ। গানের সুর হাওয়ায় মিশে আছে যেন। মেঘকন্যার দেশ পেরিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হবে সেই অনেক-আশার-দেশে, যেখানে ভোরের হাওয়ায় হীরা মানিক জ্বলে, রাতের চাঁদে ঝরে আশার রংমশাল! সাত দিন সাত রাতের পথ…আশার-বাণী তাদের টেনে নিয়ে চললো কোন্ অজানা না-পাওয়া সমুদ্রের দেশে…তারা চললো…]

পারুলদিদি—[ক্লান্তভাবে] আর কতদূর ভাই? পথ যে আর ফুরোয় না!

ফুলপরী—এ-পথ তো কোনদিন ফুরোয় না! ঐ দূরে—অনেক দূরে—আরো দূরে…সোজা পূবদিক ঘেঁষে যেতে হবে…

পারুলদিদি—আর যে পারিনা ভাই!

চম্পাবতী—এইটুকু মাত্র পথ বইতো নয়, অধীর হলে চলবে

কেন পারুল? এসো—জোরে পা চালাও, নইলে আমার স্বপনকুমার কেঁদে কেঁদে বিজন বনের ধারে এসে ঘুমিয়ে পড়বে। এসো—

[দূর থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো]

পারুলদিদি—ওমা! ঐ ঝর্ণা-ফুলের বুকে কে গো?

[আবার হাসি]

চম্পাবতী—কে গো তোমরা?

ফুলপরী—আমার পথের বন্ধু শুক ও সারী।

শুক-সারী—কোন্ দেশের রাজকন্যে তোমরা ভাই, চলেচ কোথায়?

চম্পাবতী—বকুলবনের জীর্ণপুরীর রাজকন্যে আমরা। চলেচি মেঘকন্যার দেশ পেরিয়ে অনেক-আশার-দেশে! সেখানে আমার বুকের মাণিক স্বপনকুমার আছে…

[শুক-সারী হেসেই আকুল]

শুক-সারী—বেশ, ভাই বেশ। খুব খুশী হলাম। এগিয়ে যাও তোমরা—উজান বেয়ে ছুটে চলো, আমরা গানের সুরে তোমাদের অভিনন্দন জানাই…

[চলার গান]

বন্ধু, উজান বেয়ে যাও।
শুকনো পাতার ঘর ছেড়ে ভাই আকাশ পানে চাও ॥
ওরে, সন্ধ্যা নামে মাঠের ধারে ক্লান্তদিনের শেষে,
মন ছোটে মোর তেপান্তরে মেঘকন্যার দেশে।
ঐ আকাশে নীল মেঘেদের সঙ্গী করে নাও ॥
ও-ভাই, দিক্-হারানো পথের বুকে স্বপ্ন আমার জাগে,
দূর দেশে যাই ফেরার বেলা মধুর কেন লাগে।
চিরদিনের আসা-যাওয়া সোনার তরী বাও ॥

ফলপরী—এসো চম্পাবতী, আমরা যাই মেঘকন্যার দেশে। ঐ চেয়ে দেখো ঃ আকাশে জ্যোছনা ঝল্‌মল্ করচে···ফুল-বাগানে স্বপ্ন-মৌমাছিরা গান গেয়ে গেয়ে আহরণ করচে ফুলের মধু···টগর মল্লিকা আর হাসনুহানা আনন্দ-মেলা জমিয়েচে বেনুবনের ধারে···আর গন্ধরাজ বনের পাশে সবুজ দোল্‌নায় বসে আছে মেঘকন্যা, সাতরাজ্যের রূপ যেন ফেটে উপচে পড়ে। রামধনু-রং সূর্যপরীরা মেঘকন্যার

পাশে বসে গান গাইচে…

[দূরে কাদের গলার স্বর শোনা গেলো]

এসো-এসো-এসো—

এগিয়ে চলো-এগিয়ে চলো—

চলো-চলো—

পারুলদিদি—কী সুন্দর স্বপ্নময় দেশ ! পাতায় পাতায় ডালে ডালে যেন বনের মনে রং জেগেচে—সারা দেশটায় মৃত্যুহীন প্রাণের জোয়ার ! এখানে যেন দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, মৃত্যু নেই……

[দূরে কারা যেন গান গাইচে]

—কী আশ্চর্য এই দেশ। বকুলবনের চেয়ে এই মেঘকন্যার দেশ যেন অনেক ভালো—অনেক সুন্দর…অনেক নোতুন…এই আকাশ…এই মাটী আর ঘাসের শিশির—

[মেঘের গান]

এই, মেঘের দেশের স্বপন-দোলায়

কী গান সুরে বাজে,

নীল আকাশের বন্ধু ওগো

মেঘ-বনানীর মাঝে—

সাত-সাগরের উজান-তরী
রামধনু-রং সূর্যপরী
ওগো, কোথায় আমার স্বপনকুমার
কোন্ দেশেতে রাজে !
ঘুম-কাজলের নয়ন তারা
আমার বুকে আছে—
স্বপনকুমার পক্ষীরাজের
মুক্তামালা নাচে।
মেঘকন্যার স্বপন-দোলা গানের সুরে দোলে
এই, উদাস চপল সাঁঝে।

মেঘকন্যা—কী ভাই ফুলপরী, এদ্দিনে বুঝি আমায় মনে পড়লো ?
তোমার সংগে ওরা কে ? কোন্ দেশের রূপবতী—

[হাসি যেন উপচে পড়চে]

ফুলপরী—আমার মৌ-বন্ধু বকুলবনের চম্পাবতী, আর পারুলদিদি। মনে আছে তোমার সাত ভাই চম্পার কথা, এই সেই পারুল বোন······

মেঘকন্যা—তাই নাকি ? বেশ ভাই। তোমরা কদ্দুর যাবে ?

চম্পাবতী—আমরা অনেক দূর দেশের যাত্রী।

মেঘকন্যা--তবু কোথায় শুনি ?

চম্পাবতী—অনেক-আশার-দেশে। আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে ?

মেঘকন্যা—[হেসেই আকুল] না-না-না! আগে বলো কেন যাবে সেখানে।

চম্পাবতী—আমার সাত রাজ্যের মাণিক স্বপনকুমার সেখানে আছে। আমায় শুধু ডাকে, আর বলে ঃ ওগো আমার বকুলবনের চম্পাবতী! এসো-আমার বুকে এসো—

[মেঘকন্যার উচ্ছল হাসি]

পারুলদিদি—তুমি হাসচ কেন ভাই ?

ফুলপরী—জানো না বুঝি, বলো না ভাই মেঘকন্যা, তোমার আশ্চর্য রূপকথা।

মেঘকন্যা—স্বপনকুমার চিরদিন ঐ দূর আকাশের তারার মতো হাসে। আমার অনেক দিনের বন্ধু সে। জ্যোছনা রাতে আমার ঘুম-কাজলের রাজকুমার আমায় এসে বলে ঃ

—মেঘকন্যা-মেঘকন্যা! স্বপনকুমার ডাকে
ঘুমের বেলা শেষ হয়েচে স্বপন-যুমের ফাঁকে!

তাই আমরা দুজন উজান-দেশের বন্ধু! সবাইকে সে অমন করে ডাকে ঃ আর বলে—এসো, আমার বুকে এসো—

চম্পাবতী—না-না মেঘকন্যা, তুমি জানো না। ও আমাকে ডাকে···শুধু আমার জন্যেই কাঁদে···আমি যাবো তার কাছে···যাবো-যাবো······

মেঘকন্যা—ইস্‌!

পারুলদিদি—না চম্পা, সে তোমাদের ডাকে না, ডাকে হাজার হাজার তোমার আমার মতো সাত ভাই চম্পাকে···এখানে মানুষের পরম-পাওয়ার চিহ্ন···এই আমার 'সব-পেয়েছির-দেশ,' চম্পা! এই দেশেই আমি থাকবো···আমি আর কোথাও যাবো না······

চম্পাবতী—[আশ্চর্য স্বরে] সে কি পারুলদিদি! তুমি যাবে না? না-না-তুমি জানো না—এর চেয়ে আরো সুন্দর, অনেক নোতুন দেশ আছে। সে আমার অনেক-আশার-দেশ! এসো···আমরা এগিয়ে চলি···এর চেয়ে সেই আশ্চর্য দেশ আমায় ডাকে···ঐ শোনো আশার বাণী আমায় ডাকচে···

পারুলদিদি—তোমরা দুজন যাও ভাই। আমি তোমাদের পথ চেয়ে রইলাম, আবার কবে ফিরবে সেই মাটীর ছায়ায় আমাদের বকুলবনে! বিদায়···

[পারুলদিদির গলার স্বর হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। চম্পাবতী আর ফুলপরী চললো খুব আগ্রহের সঙ্গে, মনে নিয়ে অসীম উৎসাহ। আরো তিন-দিনের পথ—তারপর স্বপনকুমারের স্বপ্নরাজ্য।]

ফুলপরী—এই তোমার আশ্চর্য দেশের সীমানা, চম্পাবতী! মেঘ নেই, হাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধু রঙের মেলা! চাঁদের দেশে যে-আলো ঝরে—সেই আলোক ছায়ায় শুয়ে আছে স্বপনকুমার আর নীলসায়রের ফুলবাগানে তোমার জন্যে বুলবুলি ভাই এনেচে গানের ডালি…

[পথ-চলার গান]

বাদল দিনের শিশির-স্বপন
ফুট্‌লো রে।
মেদুর আকাশ টুট্‌লো রে॥
আলোর নূপুর আমার গানে
জ্যোছ্‌না মায়ার আবেশ আনে
মেঘের রঙে আঘাত হানে—
বকুলবনের চম্পাবতী ফুট্‌লো রে।
জুট্‌লো রে॥

সোনার পাখী আলোয় ভাসে
যায় চলে কোন্ নিরুদ্দেশে
স্বপনকুমার তোমার পাশে—
পরান আমার আকুল হয়ে উঠ্‌লো রে।
টুট্‌লো রে॥
এমন আকাশ মেদুর হবে
নোতুন দেশে আসবে যবে
প্রাণের রেণু জাগবে তবে
মৌমাছি তাই ফুলের মধু লুট্‌লো রে।
ছুট্‌লো রে॥

বুলবুলি—পা চালিয়ে যাও চম্পাবতী! তোমার জন্যে অনেক-আশার-দেশের ছেলেমেয়েরা ব্যাকুল হয়ে আছে।

চম্পাবতী—[আনন্দে] সত্যি? সত্যি বলচ ভাই?

বুলবুলি—হ্যাঁগো, বকুলবনের রাজকন্যে!...পথের বন্ধুকে মনে কোরো...বিদায়!

[আনন্দের ঢেউ তুলে তারা আবার এগিয়ে চললো। এবার নোতুন পথ, সবুজ দেশ, আশ্চর্য রং!]

ফুলপরী—ওগো স্বপ্নরাজ্যের স্বপনকুমার। চোখ মেলে চাও…
জীর্ণপুরীর চম্পাবতী তোমার জন্যে নিয়ে এসেচে বকুল-
ফুলের মালা—

[দূর থেকে কার গলার স্বর ভেসে এলো বাঁশীর সুরে]

চম্পাবতী—চম্পাবতী। স্বপনকুমার ডাকে
ঘুমের বেলা শেষ হয়েচে স্বপন-ঘুমের ফাঁকে !

চম্পাবতী—[আনন্দে দিশাহারা] স্বপনকুমার ! আমায় তুমি
ডাকচ ?

স্বপনকুমার—চম্পা, তুমি এসেচ !

চম্পাবতী—হ্যাঁ, আমি এসেচি। সাতরাজ্য পার হয়ে তোমার
কাছে ছুটে এসেচি। আমায় নিয়ে চলো সেই অনেক-
আশার-দেশে ! তুমি আমার সাতরাজ্যের মাণিক, আমাকে
পথ দেখাও !

[স্বপনকুমার তাকে বুকে টেনে নিলো]

স্বপনকুমার—এসো চম্পা, আমার হাত ধরো। ঐ দিক্-ছোঁয়া
মাঠের সীমানা পার হয়ে আকাশের পানে চাও, সেখানে
জমানো আছে এক সবুজ দেশ, সবুজ রং, সবুজ গান।
হাওয়ায় মিশেচে সেই গানের সুর, আকাশে মেলেচে
সেই রঙের রেখা, মাটীতে ঝল্‌মল্ করচে সেই সবুজ

দেশ! চলো আমরা যাই···ঐ মাঠ-বন-সমুদ্র সব পার হয়ে শুধু এগিয়েই চলি···যুগ যুগ ধরে চলি···

চম্পাবতী—যেখানে তুমি নিয়ে যাবে আমায়, সেইখানেই আমি যাবো!

স্বপনকুমার—এ-পথের শেষ নেই চম্পা, অফুরন্ত আমাদের পথ-চলার গতি। পথের দেবতা আমাদের ডাকেন: এসো-এসো—

চম্পাবতী—জানি, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু! চলো, আমরা যাই···

[একটুখানি পরে]

ফুলপরী! ফুলপরী কই!

ফুলপরী—ওগো আমার আশার-পথের যাত্রী! তোমরা এগিয়ে চলো···যুগ যুগান্ত পার হয়ে মহাকাল পার হয়ে চলে যাও···তোমাদের পথ-চলার পাথেয় কুড়িয়ে নাও ঐ আকাশের নিঃসীম নির্জন মেঘের রঙে আর সাগরের ছন্দে···আমার এই নীলসায়রের ফুলবাগান···এই আমার সকল-পাওয়ার-দেশ! তোমার চাওয়ার শেষ নেই, আশার রংমশাল কোনদিন নেভে না···তাই পাওয়ার শেষ নেই··· তোমাদের জন্যে আমার জয়ের আশীষ্ রইলো! বিদায়, বন্ধু বিদায়······

[ফুলপরী পাখ্‌না মেলে হাওয়ায় মিশে গেলো। তারা চললো···]

স্বপনকুমার—এসো চম্পা, আমার বুকে এসো! ঐ শোনো অনেক-আশার-দেশে ভোরের পাখীরা গান গাইচে···

[দূরে কাদের গলার স্বর শোনা গেলো]

এসো ভাই, এসো—
আশার-বাণী ডাকে—
মৃত্যু-দেশে চম্পাবতী এসো—

চম্পাবতী—কী অন্ধকার এই দেশ!···কোথায় তোমার সেই চমক-লাগা স্বপ্নরাজ্যের আলো? কোথায় সেই আশার-বাণীর স্বপন-দোলা? কোথায় সেই সবুজ দেশ, সবুজ গান?

স্বপনকুমার—আছে, আছে!

চম্পাবতী—কোথায়, কোথায় আছে সেই নোতুন আলোর রং?

স্বপনকুমার—স্বপ্নরাজ্য পার হয়ে আমরা এগিয়ে চলেচি চম্পা, দূরে···অনেক দূরে—সে হোলো অন্ধকারের দেশ। সেইখানে তোমার সাতরাজ্যের 'আশা-কুমার' আছে

ঘুমিয়ে। চলো···অনেক-আশার অন্ধকারকে ভয় পেলে চলবে কেন ?

চম্পাবতী—না, তুমি থাকতে আমার ভয় কী ?

স্বপনকুমার—হ্যাঁ, আমি যে তোমার জীবন-মরণের সাথী, জোছনা-রাতের বন্ধু !

[আকাশ জুড়ে এলো ঝড়। চারদিকে নেমে এলো অন্ধকারের ছায়া—ঘন ঘন বিদ্যুৎ আর ভয়ানক অট্ট হাসি শোনা গেলো আকাশে বাতাসে···ঝড় এলো···]

চম্পাবতী—[ভয়ে] স্বপনকুমার ! কোথায় তুমি ? আমি যে পথ হারিয়ে ফেলেচি···স্বপনকুমার ! আমাকে সংগে নাও, আমাকে বাঁচাও।

স্বপনকুমার—যাও চম্পা, আশার-বাণী তোমার বুকে জ্বল্‌চে। আমি তোমার পথ চলার সাথী হলাম, তুমি এগিয়ে যাও··· অন্ধকারকে ভয় কোরো না—তুমি চলো···আর আমি তোমার বুকে এঁকে দিই আশার রংমশালের রক্ত-টিপ, জ্বালাই আগুন-ফুলের আলো······যাও চম্পা !

চম্পাবতী—না না না তুমি যেওনা—আমায় একলা ফেলে ! আমি আর কোথাও যাবো না···তুমি আমার

পাশে এসে শুধু দাঁড়াও···আমি আবার বকুলবনে ফিরে যাই···একটু দাঁড়াও······

স্বপনকুমার—বিদায় !

[ঝড় থেমে গেলো হঠাৎ। চারদিক হোলো নিস্তব্ধ নিঝুম !]

চম্পাবতী—উঃ ! কী ভীষণ অন্ধকার !···এই কী সেই মৃত্যুদেশ ?

[আকাশ জুড়ে অট্টহাসি শোনা গেলো]

মৃত্যু—কে রে, এই নিশুতি রাতে আমার বাগানে বসে কাঁদচে।

চম্পাবতী—কে তুমি ? অমন্ করে হাসচ কেন ?

মৃত্যু—আমায় চেনো না ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

চম্পাবতী—তুমি আবার হাসচ, আমার যে ভয় করচে !

মৃত্যু—ভয় করবে না ? আমি যে মৃত্যু ! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

চম্পাবতী—তুমি-ই মৃত্যু ? কিন্তু তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না !

[আকাশে আবার ঝড় এলো। দুরন্ত ঝড়—]

মৃত্যু—এ যে অন্ধকারের দেশ ! সবাই তাই আমাকে ভয় করে।

চম্পাবতী—আমি তোমায় ভয় করিনে ! সরে যাও, আমি অনেক আশার দেশে যাবো—

মৃত্যু—বটে ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !···

চম্পাবতী—পথ ছাড়ো! পথ ছাড়ো!

মৃত্যু—ইস্! আমাকে চেনো না তুমি। এমন ঘুম পাড়িয়ে দেবো যে আর জন্মেও ঘুম ভাঙ্গবে না! আমার কথা শুনলে—

চম্পাবতী—না-না শুনবো না।

মৃত্যু—যাও ফিরে যাও!

চম্পাবতী—না।

মৃত্যু—তবে ঘুমাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চম্পাবতী—[ভয়ে আকুল হয়ে] না-না—আমায় মুক্তি দাও! আমাকে পথ দেখাও!

মৃত্যু—হাঃ-হাঃ-হাঃ!…আমার দেশে এলে কারো মুক্তি নেই—

[ঝড়ের দুরন্ত গর্জনে মৃত্যুর হাসি মিলিয়ে গেলো। চম্পাবতী মৃত্যুদেশের ফুলবাগানে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর দিন আবার ভোরবেলাকার আলো পৃথিবীর বুকে আনলো সাড়া, জাগলো আবার বকুলবনের চাঁপাফুলেরা। আকাশ থেকে নেমে এলো ফুলপরী আর পারুলদিদি। এসে দেখলো মাটীতে ঝরে পড়ে আছে চম্পাবতী! ফুলপরী গান গেয়ে ডাক দিলো সবাইকে……]

ফুলপরী—বকুলবনের চম্পাবতী জাগো! প্রভাত বেলার সুর লেগেচে বনে—

পারুলদিদি—ও আর কোনদিন জাগবেনা। অনেক-আশার দেশ

ওকে বুকে তুলে নিয়েচে। এসো, এই বকুলবনের নাম দিইঃ চম্পাবতীর দেশ। এসো, টগর মল্লিকা আর বকুলবনের কনক চাঁপার দল—আমরা সবাই মিলে আজ শেষের গান গেয়ে যাই…

[শেষের গান]

ডাকে ডাকে আমায় ডাকে চম্পাবতীর দেশে,
সাত সাগরের ঝর্ণা-আলো সেই আকাশে মেশে।
অন্ধকারের বন্ধু হে মোর
নোতুন দেশের স্বপ্নে বিভোর
বিজন বনের মুক্তি ধারা, বন্ধু আমার
উধাও কি নিঃশেষে ॥
স্বপনকুমার ঘুমিয়ে আছে সোনার মেঘের ফাঁকে,
আকাশ-বাণী সেই বেদনায় আমায় শুধু ডাকে।
নোতুন দিনের আলোর ঘুঙুর
গুন্‌গুনিয়ে বাজলো যে-সুর
যুক্ত করো, মুক্ত করো, বন্ধু আমার
সকল-পাওয়ার-দেশে ॥

[রনেন ও তুষারভাই-কে :]

মৌ-বনে আজ মৌমাছি-ঝাঁক মৌ-পরীদের মৌ-মেলা
রংমশালীর রঙ্-খেলা
ভোরবেলা।
সুর-হারানো গুন্‌গুনানি চাঁদের দেশের জল্-সায়র
ঘুম-পাহাড়ের ঘুম-সায়র
হিম-সায়র !
বেগ্‌নি-ছায়ার মাঠ ছাড়িয়ে আলোক-লতার কল্পনা
সাত সাগরের জল্পনা
বলবো না !
আমার মনের হংস-মালায় বইচে দূরের জল্-হাওয়া
কোন্ সাগরের নৌ-বাওয়া
গান-গাওয়া ?
মৌ-বনে সেই স্বপ্নমালায় হাতছানি কার কোন্ দেশের
রূপকথা ভাই মেঘ-দেশের—
সব শেষের !

—ছোড়দা ও ছোটমাসী

এগিয়ে এসো বন্ধু আমার

ডাকচে তোমার 'স্বপ্নকুমার'—

হাতে নিয়ে

মোহন বেনু

চলার পথের ছন্দে মাতি!

পথের নিশান ডাকচে দূরে

হাতছানি দেয় অচীনপুরে—

কিশোর আমার কচি কিশোর,

সকল পথের শেষে—

সেইখানেতে নরম মাঠে শিশির-ভেজা চাঁদের আলো ঝরে

—ময়নামতীর দেশে!

•

—রঞ্জিতভাই